মতি নন্দী

শিবি



শিবি

মতি নন্দী



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৭

ISBN 81-7215-726-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৪৫·০০

লিখন ও দীপঙ্করকে

এমনভাবে, কাউকে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে রতন আগে কখনও দেখেনি। ব্যাপারটা অতি সামান্য, ঝগড়া করার মতোই নয়। তবু মেয়েটা গলায় ঝাঁঝ দিয়ে লোকটিকে বলল, "একি, একি বালতিটা সামনে বাড়াচ্ছেন কেন?"

রেশন দোকানে তারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। রতনের পিছনে একজন, তার পিছনেই মেয়েটি। মাঝারি গড়ন, চোয়াল চওড়া। কালি মাখিয়ে বুরুশ করা কালো জুতোর মতো উজ্জ্বল গায়ের রঙ। ঘটিহাতা ফ্রকটার হাঁটু পর্যন্ত ঝুল, বুকের কাছে ফ্রিল দেওয়া। চাপা নাকের ডগাটা উঁচু। মুখের মতোই চোখ দুটো গোল। চোখের কালো মণি এত বড় যে সাদা অংশ প্রায় নেইই। রেগে যাওয়ার জন্য জ্বলজ্বল করছে মণি দুটো। রতন মুখ পিছনে ঘুরিয়ে ওর চোখের দিকেই তাকিয়ে রইল। চোখে চোখ পড়তে মেয়েটি বলল, "দ্যাখো না, আমার আগে বালতিটা ঠেলে দিল। কেন হাতে করে রাখতে পারে না?" রতন চোখ সরিয়ে নিল। এই সব ব্যাপারে সে মাথা গলাতে চায় না।

লোকটি বলল, "রেখেছি তো কী হয়েছে, আমি তো তোমার পেছনে রয়েছি। তোমার পরেই রেশন নোব।"

"ওসব চালাকি জানা আছে। হাটান বালতি, নিজের পাশে রাখুন।" এই বলে মেয়েটি বালতিটা তুলে তার পিছনে ঠকাস করে রেখে দিল। লোকটিকে রতন আগেও দেখেছে। সামনের কালি কুণ্ডু লেনে থাকে। হাতিবাগানে দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওকে গেঞ্জি বিক্রি করতে সে দেখেছে। শান্ত নিরীহ দেখতে লোকটি অপ্রতিভ মুখে চুপ করে রইল। মেয়েটির কথা আর ভাবভঙ্গি রতনের ভাল লাগল না। ছোট-বড় জ্ঞান নেই, বয়স্কদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানে না, তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বেঁকিয়ে মেয়েটি খোঁপা খুলে হাতে প্যাঁচ দিয়ে আবার খোঁপা বাঁধল।

"লাইন যে আর চলে না। ও বদ্রিপ্রসাদজি, একটু তাড়াতাড়ি বিল লেখো না গো।" মেয়েটি দোকানের মালিককে তাড়া দিল। তাড়া রতনেরও রয়েছে। রেশন পৌঁছে দিলে ভাত রান্না হবে, তাই খেয়ে স্যার স্কুলে যাবে। সত্য শ্রীমানী বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনাথ ঘোষের রেশন তুলতে এসেছে রতন। সে স্যারের কাছে সকালে অঙ্ক শিখতে যায়। বিনা বেতনে। আরও তিনটি ছেলে পড়ে। তারা মাসে দশ টাকা করে দেয়। স্যারের বউ বীণা তাকে দিয়ে ছোটখাটো কাজ করিয়ে উশুল করে নেয় দশ টাকা।

বদ্রিপ্রসাদকে টাকা দিয়ে বিল আর রেশন কার্ডগুলো নিয়ে পাশেই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে মাল দিচ্ছে যে কর্মচারীটি তার হাতে রতন বিলটা দিল। আড়চোখে সে একবার পাশে তাকাল। মেয়েটির সাজানো দাঁতগুলো খইয়ের মতো সাদা। ব্ল্যাকবোর্ডে যেন চকের দাগ। হাতে দুখানা কার্ড। বাড়িতে তাহলে মাত্র দুজন লোক!

"আগের হপ্তায় চালে কাঁকর ছিল, এবারেও কাঁকরমণি চাল হবে না তো?"

"কেউ বলল না কাঁকর ছিল আর তুমি বলছ কাঁকর ছিল।" বদ্রিপ্রসাদ বিল লিখতে লিখতে বিরক্ত স্বরে বলল, "ঝগড়া করা তোমার স্বভাব আছে। প্রত্যেকবার তুমি ঝামেলা করো।"

"করব না তো কী? ওজনে মারলে বলব না? একবার ভিজে চিনি দিয়েছিলে মনে নেই!"

বদ্রিপ্রসাদ মেয়েটির পিছনের লোকের কার্ড নেবার জন্য হাত বাড়াল কথার জবাব না দিয়ে। রেশনব্যাগে চাল নিয়ে রতন আটা নেবার জন্য এগিয়ে দিল স্যারের পাঁচ মাস বয়সী ছেলের বালিশের ওয়াড়। ওর মধ্যে তিন সের আটা চেপেচুপে কোনওক্রমে ধরল। এক হাতে চাল ও চিনির থলি অন্য হাতে ওয়াড়ে ভরা আটা বুকের কাছে কোনওক্রমে চেপে ধরে রতন রওনা হল। ঘড়িতে দেখল সওয়া-নটা।

ট্রাম লাইন পেরিয়ে সে ফুটপাথে উঠল। খানিকটা হেঁটে ডানদিকে ঘুরে মাখন সরকার স্ট্রিট ধরে কয়েক পা যেতেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। একটা বাচ্চা ছেলে বাড়ির ভিতর থেকে হুড়মুড় করে ছুটে বেরিয়ে এসে রতনের উপর পড়ল। ছেলেটির পিছনে একটা রুল হাতে একজন, বোধহয় বাবা।

রতনের হাত থেকে আটা ভরা ওয়াড়টা পড়ে গেল রাস্তায়। ছিটকে অনেকখানি আটা ছড়িয়ে পড়ল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। বাচ্চা ছেলেটা থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সেই সুযোগে লোকটি তার চুল মুঠোয় ধরে পাছায় রুলের এক ঘা দিয়ে বলল, "পালাবি কোথা, ভগবান ঠিক আটকিয়ে দিয়েছে।" বলেই ছেলেটিকে টানতে টানতে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

রতনের চোখে তখন জল এসে গেছে। কাকিমা তাকে কী রকম হেনস্থা করবে ভেবে তার বুক শুকিয়ে গেছে। রাস্তা থেকে আটা কুড়িয়ে ওয়াড়ে ভরবে কি না, আটার সঙ্গে ধুলো ময়লা দেখলে কাকিমা কী ভাববে, তা ছাড়া রাস্তায় জীবাণু বীজাণুর ছড়াছড়ি, ওই আটার রুটি খেলে মানুষ মরেও যেতে পারে—রতন যখন এইসব ভাবছে তখনই পিছন থেকে সে শুনল: "কম্মো সেরেছে... ভোঁদার মতো দাঁড়িয়ে দেখছ কী, তোলো।"

"তুলব? কিন্তু রাস্তায় পড়ে যাওয়া জিনিস কি খাওয়া উচিত?" রতন করুণ চোখে তাকিয়ে মিয়নো স্বরে বলল।

"ওপর থেকে তুলে নাও।.... সেরটাক তো হবেই, নষ্ট করবে? পড়ল কী

করে ?”

“এই বাড়ি থেকে একটা ছেলে ছুটে বেরিয়ে এসে ধাক্কা মারল।”

“এই ওয়াড়ে করে কেউ আটা নেয় ? কে দিয়েছে এটা ?”

“কাকিমা, স্যারের বউ।”

“স্যারটা কে ? .... নাও নাও তুলে নাও, লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে যাচ্ছে।”

রতন হাতের থলি দুটো বাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে উবু হয়ে বসে আটা কুড়িয়ে ওয়াড়ে ঢোকাল। দুমুঠো তোলার পরই মেয়েটি অধৈর্য গলায় বলল, “ওভাবে খামচি দিয়ে তুলছ কেন ? এইভাবে আলতো করে তেলো।” মেয়েটি হাতের চেটো বাতাসে বুলিয়ে দেখাল। রতন নির্দেশমতো হাত বুলিয়ে তুলল ধুলোসমেত।

“ওভাবে নয়, ওভাবে নয়”। বলতে বলতে মেয়েটি তার হাতের দুটো থলি এক হাতে ধরে রতনের পাশে উবু হয়ে বসল।

“এইভাবে... এই দ্যাখো, মুখটা ফাঁক করে ধরো।”

রতন দু হাতে ওয়াড়ের মুখ খুলে ধরে রইল। মেয়েটি সন্তর্পণে হালকাভাবে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যতটা সম্ভব আটা তুলে দিল। একটি লোক বাজারের থলি হাতে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, “রাস্তা থেকে আটা তুলছ, ছি ছি। ফেলে দাও, ফেলে দাও।”

মুখ তুলে মেয়েটি চোখ কুঁচকে বলল, “কে আমার বড়লাট এল রে, যেখানে যাচ্ছেন যান... আমরা রাস্তা কুড়োনিই খাই।”

লোকটি কটমট করে তাকিয়ে তিক্ত মুখে চলে গেল। আটা ভরা ওয়াড়টা তুলে মেয়েটি নিজের কাঁখালে রাখল কলসির মতো। “পোয়াটাক পড়ে রইল, যাকগে। আর তুললে ধুলো উঠে আসবে, বাড়িতে ধরা পড়ে যাবে।”

“দাও আমায় ওটা।” রতন হাত বাড়াল।

“পারবে নিয়ে যেতে ?”

কথা না বলে সে মেয়েটির হাত থেকে ওয়াড়টা নিল।

“কদ্দুরে বাড়ি ?” মেয়েটি নিজের থলি দুটো দু হাতে তুলে নিল।

“কাছেই, গোলাপ দত্ত লেনে।”

“য়্যাঁ, গোলাপ দত্ত লেনে ! আমিও তো ওখানে থাকি, কোন বাড়ি তোমাদের ?” মেয়েটি অবাক চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

“আমাদের বাড়ি নয়, স্যারের বাড়ি, ছয়ের-বি।”

“গ্যাসওলা বাড়ির উল্টোদিকে সরু গলিতে ? বুড়িদের বাড়ি ?” হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি বলল। অনাথ ঘোষের বড় মেয়ে বুড়ি।

“হ্যাঁ, আমি ওখানে পড়তে যাই।”

“পড়তে যাও তো রেশন আনতে গেছ কেন ?”

রতন জবাব দিতে সঙ্কোচ বোধ করল। বিনা পয়সায় পড়তে গেলে এই সব কাজ করতে হয়, অপরিচিত একটা প্রায় সমবয়সী মেয়েকে সে কথা বলতে

তার লজ্জা করল। সে বলল, "রেশন না এনে দিলে স্যারকে আজ ভাত না খেয়ে স্কুলে যেতে হবে। গুরুর জন্য ছাত্রদের এটা করা কর্তব্য।" কথাটা বলে সে থুতনিটা তুলল ভারিক্কি দেখাবার জন্য।

"বুড়ির মা ভীষণ দজ্জাল। কম আটা ঠিক চোখে পড়বে। জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?"

তাই তো! রতনের বুক দুরদুর করে উঠল। একটা ছেলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, কাকিমা একথা শুনলে নিশ্চয় বলবে, "সাবধানে দেখেশুনে চলতে পারিস না? এতগুলো পয়সা নষ্ট করলি? কেন যে টেস্টে অঙ্কে ফেল করছিস এবার সেটা বুঝতে পারছিস? মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। ম্যাট্রিকটুকু পাস করতে পারবি না।" শেষের কথাটা অবশ্য স্যার বলে থাকেন।

মেয়েটি আড়চোখে রতনের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করছিল, বলল, "ওটা আমায় দাও তো, তুমি আমারগুলো ধরো। বুড়ির মাকে আমি চিনি, সত্যি কথা বললে তোমার ধুধ্বুরি ছুটিয়ে দেবে।"

গোলাপ দত্ত লেনে ঢুকে গঙ্গার জলের হাইড্রেন্টের কাছে বাঁক নিয়ে কিছুটা যাবার পর মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঁ দিকে স্যারেদের মাটির গলির মতোই সরু একটা গলি দেখিয়ে বলল, "এইটে দিয়ে গেলে আমাদের বাড়ি। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি বুড়িদের রেশনটা দিয়ে আসছি।"

রতনকে আপত্তি জানাবার সময় না দিয়ে মেয়েটি এগিয়ে গেল। দুটো বাড়ি পেরিয়েই অনাথ ঘোষেদের সরু মাটির গলিটায় ঢুকে পড়ল। রতন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বলল, কী অদ্ভুত মেয়ে! কোনওকালে আলাপ পরিচয় ছিল না অথচ এমনভাবে কথা বলল যেন কতদিনের চেনা। নিশ্চয়ই মাথায় ছিট আছে। গায়ে পড়ে উপকার করে যারা, বোধহয় তারা কিছুটা পাগলাটে হয়। লঘুগুরু জ্ঞান নেই। কিভাবে বলল, 'কে আমার বড়লাট এল রে!' কাকিমার থেকে কম দজ্জাল নয়। এইসব মেয়েদের থেকে দূরে থাকাই ভাল। কিন্তু মনটা ভাল। কী বলে রেশন দিয়ে আসছে কে জানে! এভাবে ওর হাত দিয়ে পাঠানোটা বোধহয় উচিত হল না। একটাকা ছ'আনা ফেরত হয়েছে। ওটা দিয়ে আসতে হবে। এখন দিয়ে আসার কথাই ওঠে না। মেয়েটা আসুক, কী বলেছে কাকিমাকে সেটা আগে জানা দরকার। সত্যি কথাটা নিশ্চয় বলবে না। কিন্তু বললে কী আর এমন হবে, ফাঁসি তো আর হবে না! দুটো কথা শুনতে হত, তাহলে মনের মধ্যে এই খচখচানিটা আর হত না।

মেয়েটি আসছে। চোখ দুটো আরও বড় আর গোল হয়ে মণিদুটো জ্বলজ্বল করছে মজা আর কাজ হাসিল হওয়ার খুশিতে। রতন উৎকণ্ঠিত চোখে বলল, "দিয়ে এসেছ?"

"দোব না তো কি! বললুম, কাকিমা তোমাদের এখানে পড়ে যে ছেলেটা সে রেশন তুলছিল সেই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে একটা বাচ্চা ছেলে

ওকে বলল 'বাবা ঘোড়ার গাড়ির ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, শিগ্গিরি এসো, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে'...তোমার বাবা আছে তো ?"

"আছে।"

"ভাই ?"

"নেই। দিদি আর আমি.... আর ভাইবোন নেই।"

"সেরেছে।" ঠোঁট কাঁমড়াল মেয়েটি। "তবে আমি ভাই বলিনি, বলেছি একটা বাচ্চা ছেলে... পাড়ার কোনও ছেলে হতে পারে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, ওদের বাড়ির কেউ দেখে ফেলতে পারে।"

শোনামাত্র রতন প্রায় লাফ দিয়ে পাশের সরু গলিতে ঢুকে পড়ল। এই গলিতেই মেয়েটি থাকে। "কী বললে তুমি ? আটা কম লক্ষ করেছে ?"

রতনের হাত থেকে রেশনের থলি দুটো নিয়ে মেয়েটি হাঁটতে শুরু করে বলল, "এসো বলছি।"

গলিটা মাটির। সোজা দেখা যাচ্ছে, একটা টিনের চালের বাড়ি, যার দেওয়ালের তলার দিকটা সিমেন্টের, উপর দিকটা মাটির। কাঠের গরাদ দেওয়া একটা ছোট জানলা। গলিটা ওই বাড়ির পাশ দিয়েই ঘুরেছে। তারপর ওই রকমেরই আর একটা একতলা ঘর। ঘরের লাগোয়া সদর দরজাটা এত নিচু যে মাথা নামিয়ে ঢুকতে হয়। দরজার পাল্লার তলার দিকের কাঠ পচে ভেঙে গেছে। সেখানে টিনের তাপ্পি দেওয়া। দরজার শিকল তোলা, তাতে একটা টেপা তালা লাগানো। থলি দুটো এক হাতে ধরে মেয়েটি অন্য হাতে ফ্রকটা একটু তুলে ভিতরে হাত ঢোকাল। পলকের জন্য তার চোখে পড়ল ময়লা সবুজ রঙের ইজের, তলার দিকে কুঁচি দেওয়া। রতন চোখ সরিয়ে নিল। মেয়েটার লজ্জাও নেই। ইজেরে গোঁজা চাবির রিং বার করে তার থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে সে তালা খুলল।

"কী বলেছ কাকিমাকে ?" মেয়েটি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই রতন বাইরে দাঁড়িয়ে বলল। সে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। অস্বস্তির চাপ আর সে নিতে পারছে না। খুব ভুল করেছে মেয়েটির কথা শুনে, ওর হাত দিয়ে রেশন পাঠিয়ে। ও মিথ্যা কথা বলতে পারে, সে পারে না। ওর সাহস আছে, তার নেই। ভয় না পেলে সে এভাবে ওর খপ্পরে পড়ত না। রতনের রাগ ধরল নিজের উপর। সব ব্যাপারেই তার ভয়। কত ছেলে পরীক্ষায় টুকল, সে যদি পারত, তাহলে অঙ্কে ফেল করত না।

"বলেছি ছেলেটার কথা শুনে তুমি আমার হাতে থলিগুলো দিয়ে বললে, 'এগুলো স্যারের বাড়িতে পৌঁছে দেবে ?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ দেব।' তারপর তুমি ছুটতে ছুটতে চলে গেলে। এতগুলো জিনিস একা বয়ে আনতে গিয়ে খানিকটা আটা পড়ে গেছে।... এই দ্যাখো।" মেয়েটি তার বুকের বাঁ দিক আঙুল দিয়ে দেখাল। রতন দেখল সত্যিই ফ্রকের উপর আটা গুঁড়ো লেগে

রয়েছে। চটপট বেশ তো মিথ্যা কথা তৈরি করে ফেলতে পারে।

"বাড়ির ভেতর ঢোকার আগে খানিকটা আটা লাগিয়ে নিয়েছি।" মেয়েটি খুক খুক করে হাসল। "এই সরে এসো, সরে এসো।"

"কেন।" রতন ভ্রু কুঁচকে পিছন দিকে তাকিয়ে দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার পিছনেই অনাথ ঘোষের বাড়ির খিড়কি। শোবার ঘরের একটা জানলা সে দেখতে পেল। জানলাটা বন্ধ।

"আমাদের ঘরের জানলায় দাঁড়ালে ও ঘরটার অনেকখানি দেখা যায়।"

রতন কথাটা গ্রাহ্য না করে জানতে চাইল, "কাকিমা শুনে কী বলল ?"

"বলল কতটা আটা পড়েছে ? বললাম চার খানা রুটির মতো হবে। শুনেই মুখটা প্যাঁচার মতো হয়ে গেল। মহা কিপ্টে তো, চারখানা রুটি সোজা কথা ! আমাকে আর কিছু বলল না, ছোটবেলা থেকে দেখছে তো।"

"বাবার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে শুনে কিছু বলল ?"

"বলল, 'অজ্ঞান যখন হয়ে গেছে তা হলে রতন আজ আর এখানে আসতে পারবে না, রেশন ফেরত পয়সা তোর হাতে দিয়েছে নাকি ?'.... তোমার নাম রতন ?"

"হ্যাঁ। এক টাকা ছ'আনা ফিরেছে। আমি বরং আজ সন্ধেবেলা গিয়ে দিয়ে আসব আর বলব বাবার জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছিল, হাসপাতালে নিয়ে যাবার মতো কিছু হয়নি। এখন হেঁটে বেড়াচ্ছে।" সে উৎকণ্ঠিত চোখে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। ব্যাপারটা ঠিকমতো সাজানো গেছে কি ? মেয়েটি মাথা হেলিয়ে, হাসল। ঠোঁটের মাঝে খই ছড়িয়ে গেল।

"তোমার বুদ্ধি আছে দেখছি... এখন এসো, আমার কাজ আছে।"

রতন কথা না বলে মাথা বাঁচিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। হাফ প্যান্ট পরলেও এখন সে যথেষ্ট লম্বা। পিছনে দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। 'তারও বুদ্ধি আছে' এমন কথা সে এই প্রথম শুনল।

গোলাপ দত্ত লেনে পা দেবার আগে বাড়ির ধার ঘেঁষে একচোখ বার করে দেখে দিল, স্যারের কোনও ছেলে বা মেয়ে রাস্তায় আছে কি না। নেই। সে প্রায় দৌড়ে হাইড্রেন্টের কাছে বাঁকটা ঘুরে মন্থর হল। এতক্ষণের টানটান অবস্থাটা তার ঢিলে হতে শুরু করেছে। রাস্তায় আটা পড়ে যাওয়া থেকে এখন পর্যন্ত যা ঘটল, তার কাছে সবটাই সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটাকে আগে কখনও দেখেনি অথচ গত দু মাস সকালে সে গোলাপ দত্ত লেন দিয়ে হেঁটে অঙ্ক শিখতে আসছে ! বুধবারে স্যারের রেশন তোলার দিন, এই নিয়ে ছ'সাতবার রেশন তুলে দিয়েছে। মেয়েটারও নিশ্চয় বুধবারই দিন, কিন্তু কখনও ওকে দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। হয়তো বিকেলে রেশন তোলে।

মাখন সরকার স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে রতনের মনে এল বাবার কথা। বাবা ঘোড়ার গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে গেছে, এমন একটা খারাপ খবর মিথ্যে বানিয়ে

মেয়েটা বলে দিল তাকে কিনা একটা সামান্য বকুনি থেকে বাঁচাবার জন্য! নিশ্চয়ই মেয়েটার বাবা নেই, থাকলেও বাবাকে বোধহয় ভালবাসে না। নয়তো ঘোড়ার গাড়ির ধাক্কা দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলার মতো ব্যাপার ভাবতে পারত না। এতে তো বাবা মারাও যেতে পারে। তার মনে একটা অমঙ্গলের কাঁপন উঠে মিলিয়ে গেল। বাবাকে একবার চোখে দেখার জন্য তার মন আনচান করে উঠল।

রতনের বাবা গুপিনাথ রায় তার যৌবনকালে নামকরা সাঁতারু ছিল। রোজ ঘণ্টা দুয়েকের জন্য শোভাবাজারের জগন্নাথ ঘাটে সে গঙ্গায় নামত। ওপারে সালকিয়ার বাঁধাঘাটে লঞ্চের জেটি ছুঁয়ে আবার সাঁতরে ফিরে আসত। ইচ্ছে হলে ফেরার সময়ে লঞ্চে উঠে পড়ত। মাল্লারা দুরদুর করে তাড়া করলে জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতরে ফিরে আসত। এটা ছিল তার আমোদ। এ ব্যাপারে তার সঙ্গীসাথী ছিল তিন-চার জন। গুপি চারবার ম্যাট্রিক পাস করার জন্য চেষ্টা করেছিল, পারেনি। তবে গঙ্গায় ত্রিবেণী থেকে আহিরিটোলা ঘাট বা বালি ব্রিজ থেকে বাগবাজার ঘাট পর্যন্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় পরপর দু বছর প্রথম হয়েছে। দশ টাকার নোটের মালা গলায় পরেছে, একটা মোটর সাইকেল পুরস্কার পেয়েছে। তাছাড়া কাপ, মেডেল, গরম শাল, ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়াও উপহার পেয়েছিল সোনার হার, আংটি।

চব্বিশ বছর বয়সে গুপি হয়ে উঠেছিল পাড়ার নায়ক। তার অনেক ইয়ারবন্ধুও জুটে গেল। মোটরবাইক ভটভটিয়ে সে ঘুরে বেড়াত। সন্ধ্যার পর ইয়ারদের আড্ডায় গাঁজা খাওয়া শুরু করল এবং মদও। বাড়িতে এই নিয়ে যা হয়, অশান্তি শুরু হল। আত্মীয়স্বজনরা পরামর্শ দিল, বিয়ে দাও শুধরে যাবে। বিয়ে দেওয়া হল বারাসাতের গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ে উমারানির সঙ্গে। সেই সময় গুপির বাবা শম্ভুচরণ রিটায়ার করলেন জার্ডিন হেন্ডারসনের বড়বাবুর চাকরি থেকে। হাতে কিছু টাকা পেয়েছেন, গুপি বাবাকে বলল ব্যবসা করব। দেহাত থেকে ঘি আনিয়ে কলকাতার আড়তে বিক্রি করার ব্যবসা। টিন টিন ঘি আসতে লাগল বাড়িতে। একতলার বাইরের ঘরটা গুদাম হয়ে উঠল।

কয়েকমাস গুপির ব্যবসা ভালভাবে চলার পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। এর পরই তার ব্যবসা গোঁত খেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করে। দু-একজন তাকে পরামর্শ দিল, ঘিয়ের সঙ্গে চর্বি মেশাতে। গুপি রাজি হয়নি। তার কপাল এমনই মন্দ যে শম্ভুচরণও এই সময় সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন। আর গুপিকেও বিছানায় ফেলে দিল অত্যাচারে বিধ্বস্ত শরীর। পাকস্থলী, লিভার এবং ফুসফুস একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তার স্বাস্থ্য এবং ব্যবসাটাকে ধসিয়ে দিল। ভাই বিষ্ণুচরণ তখন সদ্য কলেজে ঢুকেছে আই এ পড়ার জন্য। ব্যবসা দেখার ভার তার উপর ছেড়ে দিয়েছিল গুপি। বিষ্ণুর পক্ষে উত্তরপ্রদেশি আড়তদারদের অসাধুতার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ব্যবসা ডুবে গিয়ে গুপির ঘাড়ে হাজার সাতেক টাকার দেনা চাপল। মোটরবাইক, সোনার হার,

আংটি বিক্রি করেও অনেক টাকার দেনা বাকি রয়ে গেল। তখন রতন আর অর দিদি মানসী নেহাতই শিশু।

বাড়িটা ছিল গুপিনাথের মায়ের নামে। মা এবং ভাইকে বুঝিয়ে সে বাড়িটা বিক্রি করাল। তখন জাপানিরা রেঙ্গুনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। বর্মা থেকে মানুষজন হেঁটে হেঁটে ভারতে পালিয়ে আসছে। কলকাতায় ব্ল্যাকআউট। সন্ধ্যার পর জামার হাতায় লাল পটি জড়ানো সিভিক গার্ড রাস্তায় টহল দিয়ে ফেরে। জানলা দিয়ে একটু আলো বেরোলেই কড়া নাড়ে। ফাঁকা জমিতে ইংরাজি 'জেড' অক্ষরের মতো স্লিট ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে। মাঝে মধ্যে সাইরেন দিনের বেলায় বাজে, রাতে তো বাজেই। কলকাতার লোকেরা বোমার ভয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে পালাচ্ছে। বাড়ি কেনার খদ্দের কোনওক্রমে জোটানো গেল। অর্ধেকেরও কম মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় বাড়িটা বিক্রি করতে হল।

দেনা শোধ করে গুপিনাথ খুঁজেপেতে দর্জিপাড়ায় এক বুড়ি বিধবাকে বার করল যার তিনকূলে কেউ নেই। অলিগলিতে তখন বাড়ির সদর দরজায় 'টু লেট' লেখা টিনের প্লেট আঁটা। সস্তায় ঘর বা বাড়ি ভাড়া প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। বিধবা বুড়ি থাকে ছোট একটা ছাদ নিয়ে দোতলার একখানা ঘরে। নীচের দুটো ঘর ভাড়া দেওয়া ছিল। ভাড়াটে সপরিবারে পালিয়ে গেছে ভদ্রেশ্বরে। বুড়ির একমাত্র আয় বন্ধ। এমন সময় গুপিনাথকে পেয়ে বুড়ি বেঁচে গেল। গোটা একতলাটা সে কুড়ি টাকা ভাড়ায় পায়। তেরোর-এক নম্বর নব মিত্তির লেনের এই বাড়িতে এসে রতন প্রথম ভর্তি হল স্কুলে—সরস্বতী পাঠশালায় ইনফ্যান্ট ক্লাসে।

দুই

গ্রে স্ট্রিট আর গৌরব দত্ত স্ট্রিটের মোড়ে গুপিনাথের পাতা আর গুঁড়ো চায়ের দোকান। হেঁটে বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। রতন মেপে দেখেছে দোকানটা ঠিক চার হাত চওড়া। কাউন্টার হল একটা তিন হাত চওড়া টেবিল। দোকানের ভিতরে ঢোকার পথ এক হাত চওড়া। টেবিলের উপর চারটে লাল রঙের টিনের বড় কৌটো। প্রতিটিতে সাদা রঙে লেখা 'চা'। ঘরটা লম্বায় বারো হাত। তার শেষপ্রান্তে দেয়ালে ঘেঁষে একটার উপর একটা চায়ের পেটি। গুপিনাথের বসার জন্য একটা হাতলওলা কাঠের চেয়ার, তার ডান দিকে একটা কাঠের র‍্যাক, তাতে বসানো আছে দাঁড়ি পাল্লা, বাটখারা, পেটি থেকে চা বার করার ডালা, আর একটা পুরনো দশ-সেরি রেমিংটন টাইপ মেশিন। দোকানের মাথায় সাইনবোর্ডে লেখা 'উমা টি স্টোর্স'। তার নীচে ছোট অক্ষরে 'খাঁটি দার্জিলিং ও আসাম চা পাওয়া যায়।' দোকানের দরজায় পেরেকে ঝুলছে একটা স্লেটের কালো টিনে সাদা অক্ষরে লেখা 'এখানে টাইপ করা হয়।'

রতন ট্রামরাস্তার ওপার থেকে দেখল চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসে বাবা টাইপ করছে। বুকের মধ্যেকার অস্বস্তি ভাবটা কেটে গিয়ে এবার সে অবাক হল। গত এক বছরের মধ্যে বাবাকে কেউ কিছু টাইপ করতে দিয়েছে বলে তার মনে পড়ল না। টাইপ মেশিনটা ছিল তাদের বাড়িওয়ালি বুড়ির, যাকে সে নতুন ঠাকমা বলে ডাকত। তখনও বেঁচেছিলেন তার নিজের ঠাকুমা, গুপিনাথের মা। নতুন ঠাকমার কাছে একজন ওটা বাঁধা রেখে তিরিশ টাকা নিয়েছিল। কিন্তু আর ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। বছর চারেক খাটের নীচে পড়েছিল, গুপিনাথ তিরিশ টাকা দিয়ে সেটা কিনে নেয়। এক সময় সে টাইপ স্কুলে ভর্তি হয়েছিল বাবার চাপে, যদি কোথাও টাইপিস্টের চাকরি পায়। টাইপ করাটা ভালই শিখেছিল। কিন্তু টাইপিস্ট হওয়ার বদলে সে ঘিয়ের ব্যবসা শুরু করে, টাইপ করাটা প্রায় ভুলেই যায়।

টাইপ মেশিনটা গুপি যখন পেল তখন সে বাড়ি বিক্রির টাকার কিছুটা দিয়ে চা-এর দোকান খুলেছে। মেশিনটা দোকানে নিয়ে গেল এই আশায়, চা বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করেও কিছু উপরি রোজগার করবে। কিন্তু তা আর হয়নি। মেশিনের অক্ষরগুলো এমনই ঘষা যে ছাপ কাগজে ভালমতো পড়ে না, পাঁচ-ছটা অক্ষর আধভাঙা, টাইপের পর কালি বুলোতে হয়। অক্ষরের মাঝের ফাঁকগুলোও অসমান থাকে। এইসবের জন্যই একবার যে টাইপ করিয়েছে দ্বিতীয়বার সে আর আসে না। গুপিনাথ ফুলস্ক্যাপ পাতার চার আনা রেট কমিয়ে বারো পয়সা করেছে, তবুও খদ্দের আসে না।

বাবাকে টাইপ করতে দেখে রতন রাস্তা পার হয়ে দোকানের দরজায় দাঁড়াল। গুপি ঘাড় গুঁজে টাইপ করছে একটা খোলা বই থেকে। দুটো বাটখারা বইয়ের পাতার উপর। মোটা পুরনো বই, পাতাগুলো হলদেটে।

"এসেছিস, ভালই হল। এগুলো একটু ঠিক করে দে তো।" গুপি মেশিনের পাশে রাখা টাইপ করা তিনটে পাতা হাত দিয়ে ঠেলে দিল। রতন টেবিলের ড্রয়ার খুলল ফাউন্টেন পেনটা বার করার জন্য। একটা বাটিতে খুচরো রেজগি থাকে। সেটায় কিছু দু আনি, সিকি, একটা ক্লিপে পাঁচ টাকা আর এক টাকার নোট। আজকের সকালের বিক্রি।

বেশি ঘষা আর ছাপ না পড়া অক্ষরগুলো সে কলম দিয়ে ঠিক করে দিতে লাগল দাঁড়িয়েই।

"ঘণ্টা খানেক আগে দিয়ে গেল, এক্ষুনি চাই।" গুপি বলল।

"কী বই ?"

"কে জানে। কলেজে পড়ায়, পড়ার বই-টই হবে।" গুপি কি বোর্ডে চোখ রেখে দায়সারা উত্তর দিল। রতন বুঝল, বাবার পক্ষে এই বইয়ের ইংরিজি পড়া সম্ভব নয়। তার নিজের পক্ষেও সম্ভব নয়। বেশ শক্ত শক্ত বানান আর মানে করাও শক্ত। সে কিছু চেনা শব্দ থেকে বুঝছে এটা আর্য সভ্যতার ব্যাপার নিয়ে লেখা।

"কে টাইপ করতে দিল ?"

"এই দুটো বাড়ি পরে বারান্দাওলা বাড়িটায় থাকে, প্রফেসার... মেয়েছেলে, বিধবা। আমার কাছ থেকেই বারো টাকা পাউন্ডের চা নেয়। বলল, বইটা আজই ফেরত দিতে হবে।"

বিড়বিড় করে বই থেকে শব্দগুলো বানান করে করে গুপি টাইপ করছে। রতনের মনে হল, এত অশিক্ষিতের পক্ষে টাইপিস্ট হওয়া চলে না। চাকরির দরখাস্ত পর্যন্ত ঠিক আছে। তার থেকে অন্যরকম কিছু হলে, যেমন এই বইটা, তাহলেই মুশকিলে পড়ে বাবা।

"রতু, এগুলো দিয়ে আসতে পারবি ?" গুপী টাইপ শেষ করে কাগজটা রতনের দিকে এগিয়ে দিল। "ভুলটুল কিছু হয়েছে ?" উদ্বেগ নিয়ে বলল।

"হয়েছে কি না জানি না।.... রিবনটা বদলাবে তো, এত খারাপ টাইপ দেখলে কী বলবে !"

গুপি অবসাদগ্রস্তের মতো চোখ নিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে লজ্জার আভাস। "রিবন কিনে আনব ভাবছিলুম, কিন্তু এমন ব্যস্ত হয়ে বলল এক্ষুনি চাই... পড়তে তো অসুবিধে হচ্ছে না, হচ্ছে ?"

রতন জবাব না দিয়ে পাঁচটা পাতা জড়ো করে গুছিয়ে নিয়ে বলল, "কিছু বলতে হবে ?"

"কী আর বলবি। বইটা সঙ্গে নে।"

বারান্দাওলা বাড়ির সদর দরজাটা খোলা রয়েছে। ভিতরে ঢুকে রতন চাকরের মতো একজনকে দেখে বলল, "এখানে প্রফেসর কে আছেন ?"

লোকটার মুখ ভর্তি পান। গাল দুটো ফুলে রয়েছে। মুখটা উঁচু করে যাতে পিক না বেরিয়ে আসে, কোনওক্রমে বলল, "এই থিড়ি দিয়ে ওপরে থলে যাও, ডানদিকে ঘর।"

পুরনো বাড়ি, বেলে পাথরের সিঁড়ি। রতন দোতলায় উঠে এসে ডানদিকে একটা ঘর দেখল। দরজায় নীল পর্দা ঝুলছে। জানান না দিয়ে ঘরে ঢোকা ঠিক নয়। কিছু বলে ঢোকা উচিত কিন্তু কী বলবে, সে তো প্রফেসরের নাম জানে না। ইতস্তত করে পর্দার একটা ধার সরিয়ে সে ভিতরে উঁকি দিল। প্রথমেই চোখে পড়ল কয়েকটি বই ভরা আলমারি। পর্দাটা আর একটু সরাতে দেখতে পেল একটা টেবিল তার উপর ছড়ানো বই আর খাতা। একটি মেয়ে মাথাটা হেলিয়ে একমনে কী লিখছে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। ধবধবে রঙ। কানে ইয়ার রিং। আঙুল দিয়ে নাকের পাশ চুলকে মুখটা তুলে অন্যমনস্কের মতো তাকাল।

"কে ? কী চাই ?" অবাক হয়ে গেছে পর্দা সরিয়ে একজনকে তাকাতে দেখে।

"ভেতরে আসব ?" রতন কুণ্ঠিত স্বরে বলল। মেয়েটি মাথা নাড়ল।

"টাইপ করতে দিয়েছিলেন, নিয়ে এসেছি।" রতন টেবিলের সামনে এসে

দাঁড়াল।

"দেখি।" হাত বাড়াল মেয়েটি। "মা টাইপ করতে দিয়েছিল পাশের চায়ের দোকানে।" কাটা কাটা উচ্চারণ, নরম গলা। রতন এমন ধীরভাবে কাউকে কথা বলতে শোনেনি।

"হ্যাঁ আমার বাবাকে।"

পাতাগুলো একটা একটা করে দেখছে। রতন ওর মুখের ভাব তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করে যাচ্ছে। ভ্রূ দুটো কুঁচকে, একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে রয়েছে মুখে। কাগজগুলো রেখে উঠে দাঁড়াল। "মাকে ডেকে আনছি, তুমি বসো "

ঘরের আর একটা দরজা দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে গেল। রতনের চোখে পড়ল ওর পায়ে লাল কাপড়ের চটি। আরও দুটো কাঠের চেয়ার রয়েছে। রতন বসল। ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় যাওয়া যায়। বারান্দায় টবে চন্দ্রমল্লিকা ফুল ফুটে রয়েছে। দেয়ালে দুটো বড় ছবি। কাঁধে পাট করা শাল, গোঁফওলা এক বৃদ্ধ চেয়ারে বসে, হাতে ছড়ি, পায়ে পাম্পশু, ধুতির পাড়টা চওড়া। অন্য ছবিটা একজন অল্পবয়সীর। কোট পরা, গলায় টাই ছবিটা বুক পর্যন্ত। ঝকঝকে চোখে হাসি ফুটে রয়েছে। কপালটা সামান্য উঁচু, অনেকটা এই মেয়েটির মতো। একটা সোফাও রয়েছে। টেবিলে ক্যালেন্ডার, কলমদানি আর ব্লটিং প্যাড।

রতন ছড়ানো খাতাগুলোর একটা মলাটে ইংরেজিতে লেখা নামটা পড়ল, 'রমলা লাহিড়ী। বেথুন স্কুল।' ক্লাস টেন-এ পড়ে। সেকশন আর রোল নম্বরও লেখা। সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে সে খাতাটা একটু খুলল। সুন্দর হাতের লেখা। তিন-চারটে লাইনে চোখ বুলিয়ে তার মনে হল জাজমেন্ট সিট অফ বিক্রমাদিত্য থেকে প্রশ্নের উত্তর। সেও এবার পরীক্ষা দেবে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর লেখা এমন কোনও খাতা তার নেই। যারা ভাল রেজাল্ট করতে চায় তাদেরই এইরকম খাতা থাকে, তারা সারাদিন পড়ে। হয়তো সন্ধ্যায় মাস্টার আসে পড়াতে।

"কই দেখি.... খুব তাড়াতাড়ি হল দেখছি।"

রতন দাঁড়িয়ে পড়ল। রমলার দিদি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সোনালি ফ্রেমের চশমা, কানে মুক্তো, হাতে দু গাছা সোনার চুড়ি, হাল্কা হলুদ রঙের তাঁদের শাড়ি, কব্জিতে ঘড়ি, হাতে একটা ব্যাগ। এত সুন্দর স্ত্রীলোক আগে সে কখনও দেখেনি। তার মনে হল এখুনি বোধ হয় উনি বাইরে কোথাও যাবেন।

টাইপ করা পাতাগুলো উল্টে পাল্টে দেখে হাসলেন। "পড়া যাচ্ছে। যাক তাড়াতাড়ি তো পেলাম।"

মন্তব্যটা শুনে রতনের মুখ গরম হয়ে উঠল। রমলার মা হাত ব্যাগ খুললেন। "কত দিতে হবে ? তিন আনা করে তো ?"

এক টাকার নোটটা দেখে রতন বলল, "আমার কাছে তো ভাঙানি নেই।"

বলেই মনে পড়ল তার পকেটে রেশন ফেরত এক টাকা ছ আনা রয়েছে। সে পকেটে হাত ঢোকাল। "আছে আমার কাছে।"

"থাক এক আনা আর ফেরত দিতে হবে না। তুমি দোকানে কী করো ?"

রতন থতমত হল। তাকে বোধহয় কর্মচারী ভেবেছে। ভাবলে দোষ দেওয়া যাবে না। তার চেহারায় এমন কিছু বিশেষত্ব নেই চোখে পড়ার মতো, যেমন রয়েছে এই দুজনের মধ্যে। গায়ের রঙের মতোই তার হাফ প্যান্ট, শার্ট, চটি সবই ময়লা আর কমদামি, চুলও রুক্ষ ঝাঁকড়া। শুনেছে তার চোখ-মুখ মিষ্টি আর নিরীহ। কিন্তু তাই দিয়ে তো কাউকে বোঝা যায় না সে মালিক, না চাকর। অনেক চাকরই মনিবের থেকে দেখতে সুন্দর হয়। দোকানটা এত ছোট আর দরিদ্র যে মালিকের ছেলে বললে এরা তাকে পাত্তা দেবে না।

"যিনি টাইপ করছেন তিনি আমার বাবা।"রতন আত্মসমর্পণের মতো স্বরে বলল। কেন বলল তা সে জানে না। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। এদের সামনে নিজেকে ক্ষুদ্র বিবেচনা করতে তার লজ্জা হচ্ছে না। "টাইপরাইটারটা খুব পুরনো।"

"তোমার বাবা ?..... আচ্ছা। তুমি কী করো, পড়ো ?"

"এবার ম্যাট্রিক দোব।" রতন দেখল রমলা মুখ তুলে তাকাল। কৌতুহলী চোখ।

"কোন স্কুলে পড়ো ?"

"সত্য শ্রীমানী বিদ্যালয়ে।"

রমলার মা ভ্রূ তুললেন। নামটা কখনও শুনেছেন কি না মনে করার একটা চেষ্টা চোখে ফুটে উঠল। রতন মনে মনে কুঁকড়ে গেল। কৈফিয়ত দেবার মতো স্বরে বলল, "খুব ছোট স্কুল, নিমতলায়।"

"ভাল করে প্রিপারেশন করছ তো।" তিনি মেয়ের দিকে তাকালেন। রমলা মাথা নিচু করে নিল। "তখন তোমাদের দোকানে গিয়ে বলতে ভুলে গেলাম এক পাউন্ড চা চাই। রমু গদাকে বলো তো চা আনতে।"

"আমি এনে দেবো ?" ব্যগ্র হয়ে রতন বলল।

"না না তুমি আনবে কেন ? ... আচ্ছা, এবার আমাকে তো এখুনি কলেজ যেতে হবে। বইটা একদিনের জন্য এনেছি। ফেরত দিতে হবে আজই" খুবই মিষ্টি করে তিনি রতনকে বিদায় জানালেন।

রতন ফিরে এল দোকানে, গুপিনাথ টেবিলে কপাল ঠেকিয়ে কুঁজো হয়ে রয়েছে। রতন "বাবা" বলে ডাকতে ধীরে ধীরে মাথা তুলল। মুখে অসুস্থ অবসন্ন ভাব, চোখ বসে গেছে। প্রায়ই বুকে ব্যথা হয়। কোবরেজ মশাইকে দেখিয়েছিল। তার দেওয়া ওষুধই খাচ্ছে। "শরীরটা ভাল ঠেকছে না... দিয়ে এলি ? কপি দেখে কিছু বলল ?"

"কী আবার বলবে," রতন এক টাকার নোটটা টেবিলে রাখল। "এবার এই টাইপ রাইটারটাকে সের দরে বেচে যাও.... লোকে হাসে।"

"বেচব কেন, অসুবিধে তো করছে না। .... তুই টাইপিংটা শেখ না। রোজ কিছুক্ষণ প্র্যাকটিস কর আমি দেখিয়ে দেব। আর সেই সঙ্গে শর্ট হ্যান্ডটাও যদি শিখে নিতে পারিস চাকরি বাকরি পেতে সুবিধে হবে, বিষ্টু বলছিল ওদের অপিসে টাইপিস্ট নেবার কথা হচ্ছে। রেগুলার প্র্যাকটিস করলে—"

"না।" রুক্ষ স্বরে রতন বাবাকে থামিয়ে দিল। "চাকরি বাকরি পরে হবে, বি এ পাস করার পর। তাছাড়া কাকার অফিসে আমি চাকরি করব না।"

"কেন !" গুপি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

"কেন আবার কী ? কাকার আচার-ব্যবহার দেখো না ? আমাদের তো মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। কথায় কথায় খোঁটা দেয়। .... সংসারে কটা টাকা দিয়ে যেন সবার মাথা কিনে নিয়েছে।"

"এভাবে কথা বলিসনি রতু, বিষ্টু আমাদের জন্য অনেক করে। সংসার তো ওই চালায়, আমার আর রোজগার কী ? বাড়ি বিক্রির আদ্দেক টাকা তো ওর পাওয়ার কথা কিন্তু কোনওদিন ভাগ চায়নি। আমি নিজের দেনা শোধ করেছি তাই দিয়ে, এই দোকানটা কিনেছি অবশ্য, মায়ের শ্রাদ্ধও সেই টাকায় করেছি। তাহলেও বি এস পাস করানো ছাড়া ওকে আমি কিছুই দিইনি, উল্টে সংসারটাই ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি... বিয়ে থা করেনি, সে তো তোদেরই জন্য।" একটানা কথাগুলোকে প্রায় আবেদন জানানোর মতো ভঙ্গিতে বলে গুপি হাঁফাতে লাগল। বুকের ব্যথাটা বাড়ছে।

রতন মুখ নামিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "দোকানটা বিক্রি করে দাও, তোমার পক্ষে আর চালানো সম্ভব নয়।"

"সে কি রে, তুই দোকানে বসবি না ?"

"না। এইটুকু জায়গায় দশ-বারো ঘণ্টা বসে জীবন কাটাতে পারব না।" কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষায় সে আর দাঁড়াল না। বাড়ি ফিরে সে শুখতলা খয়ে যাওয়া জীর্ণ চটিটা খুলে উমারানিকে বলল, "মা, কাকাকে বলো না একজোড়া কাবলি শু্য কিনে দিতে। এই চটিটা দিয়ে আর হাঁটা যায় না।"

"তুই নিজে বল না।"

"না।"

বিষ্ণুচরণ, মা মারা যাওয়ার পর ঘরটায় একাই থাকে। ট্রাম কোম্পানিতে চাকরি করে ক্যাশ বিভাগে। অফিস যাবার সময় ঘরে তালা দিয়ে যায়। সে কাউকে বিশ্বাস করে না। কাঠখোট্টা, সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলা হিসেবি লোক। কোনও নেশা নেই। খবরের কাগজ ছাড়া কিছু পড়ে না। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না। খুব ভোরে ওঠে, থলি নিয়ে বাজার যায়। প্রতি মাসে ইলেকট্রিক বিলের টাকা দেয়, রতনকে জমা দিয়ে আসার জন্য— আর স্কুলের মাইনে। বাড়িভাড়া কুড়ি টাকা থেকে বাইশ টাকা হয়েছে বাড়িউলি বেঁচে থাকতেই। ভাড়ার টাকা বিষ্ণু দেয় এবং রেশনেরও। এখন সে ব্যস্ত ভাইঝি মানসীর জন্য পাত্র খোঁজায়। উনিশ পার হতে যাচ্ছে আর ওকে ঘরে রাখা

ঠিক নয়। একমাত্র এই ভাইঝির সঙ্গেই সে নরম স্বরে কথা বলে, আবদার করে কিছু চাইলে প্রত্যাখ্যান করে না। ক্লাস এইটের পর মানসীকে বিষ্ণুই স্কুল ছাড়িয়েছে। বাড়ন্ত গড়ন, দেখতেও সুশ্রী, অতটা হেঁটে স্কুলে যাওয়াটাকে বিষ্ণু বিপজ্জনক মনে করে। এতে অবশ্য কেউ আপত্তি তোলেনি শুধু রতন ছাড়া। তবে সেই ভাবেই বলেছিল যাতে আপত্তিটা কাকার কানে না পৌঁছয়। বাড়ির বাইরে যাওয়ার সুযোগ নষ্ট হওয়ায় মানসী কান্নাকাটি করেছিল কিন্তু বিষ্ণু টলেনি। একটা পুরনো হারমোনিয়াম কিনে দিয়ে বলেছিল, "ঘরে বসে গান শেখ।"

পাড়ায় একটা লাইব্রেরি আছে, "তরুণ পাঠাগার"। তিন-চারজন তরুণ মিলে, তিরিশটি বই দিয়ে শুরু করেছিল। পনেরো বছরে বই-সংখ্যা প্রায় হাজারে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি বাড়ি থেকে বই চেয়ে, সরকারের শিক্ষা বিভাগ আর কলকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক দান থেকে বই কিনে এখন পাঠাগার মোটামুটিভাবে চলে। তবে এত কম বই থাকায় পড়ুয়া মেম্বাররা মাস কয়েক পরই সম্পর্ক ত্যাগ করে। যারা উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা এখন কাজকর্মে ব্যস্ত, সংসারী। পাঠাগারে রোজ এসে কাজকর্ম দেখা তাদের পক্ষে আর সম্ভব না হওয়ায়, দায়িত্ব এসে পড়েছে অল্পবয়সীদের উপরে। সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যায় পাঠাগার দু ঘণ্টার জন্য খোলা, বই লেনদেনের আর চাঁদা নেওয়ার কাজ একাই করে রতন। অবৈতনিক কাজ।

বিকেলে সে বাড়ি থেকে বেরোল। তরুণ পাঠাগারে যাওয়ার আগে এক টাকা ছ আনা ফেরত দিয়ে আসার জন্য। স্যারের বাড়ির আগের গলিটার দিকে পলকের জন্য সে তাকাল, কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে জল-কুমির খেলছে। যদি ওকে দেখতে পেত তাহলে কী করত ? রতন ভাবল, একটু হেসে চলে যেতুম। কিংবা বলতুম, "ফেরত পয়সাটা দিতে যাচ্ছি।" শুনে হয়তো হাসত, খই ছড়িয়ে পড়ত ঠোঁট দুটোর মাঝখানে। কিংবা গোল গোল চোখদুটো বড় করে ও হয়তো বলত, "সকালের রেশনের পয়সাটা দিতে যাচ্ছ বুঝি ?"

অনাথের বউ বীণা কিছু বলার আগেই রতন বলল, "বাবা ভাল আছে কাকিমা। হাঁটুতে একটু লেগেছে, কনুইটা ছড়ে গেছে—"

"থাম হতভাগা।" বীণা চেঁচিয়ে উঠল। "মিথ্যে কথা বলার আর লোক পেলি না, আমি কিছু জানি না ভেবেছিস ?"

রতন হতভম্ব হয়ে গেল। কাকিমা জেনে ফেলেছে। কী করে ?

"শিবি আমায় সব বলে দিয়েছে।"

"শিবি ! শিবি কে ?"

"আর ন্যাকামি করতে হবে না। আমার অতটা আটা তুই রাস্তায় ফেলে আবার রাস্তা থেকে কুড়িয়ে থলিতে ভরেছিস ? সেই আটা আমাদের খাওয়াবি ?"

পাথর হয়ে গেল রতন। তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। এখন আর মিথ্যা কথা

বলে লাভ নেই। "ওই মেয়েটাই আমাকে নিজে থেকে বলল পৌঁছে দিয়ে আসব আমাকে দাও, তাই দিলুম। ওই আমাকে গল্প বানিয়ে মিথ্যে কথা বলেছে।"

"হ্যাঁ, এখন তো এইসবই বলবি। এই তো বললি বাবার হাঁটুতে লেগেছে, কনুই ছড়ে গেছে, এসবও কি শিবির বানানো। দ্যাখ রতন, ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। তোকে দেখতেই ভালমানুষ, আসলে তুই মিটমিটে শয়তান। সব আটা আমায় ফেলে দিতে হল। এক পয়সা মাইনে তো দিস না আর এতগুলো পয়সা ক্ষতি করে দিলি!"

রতনের চোখ জলে ভরে এসেছিল। এবার টপটপ করে পড়তে শুরু করল। স্যারের কাছে অঙ্ক শেখা আর হবে না। বাবা ধরাধরি করে বিনি পয়সায় শেখার ব্যবস্থাটা করে দিয়েছিল। সেই কোন যুগে স্যারের মা গঙ্গায় চান করতে গিয়ে ভেসে যাচ্ছিল জোয়ারে, বাবা সাঁতরে গিয়ে তাকে পাড়ে টেনে তোলে। ঘটনাটা স্যারের মনে ছিল বলেই গুপিনাথের অনুরোধে তাকে অঙ্ক শেখাচ্ছে। কিন্তু কাকিমার এই রাগের পর আর কি সে এ বাড়িতে ঢুকতে পারবে? বউয়ের কথায় স্যার তো ওঠেবসে।

"তুই কোন আক্কেলে রাস্তার আটা আমাদের খাওয়াবি ভাবলি?"

"আমি ভাবিনি। ওই মেয়েটাই কুড়িয়ে তুলে দিল আর ভয় দেখাল বুড়ির মা ভীষণ দজ্জাল, সত্যি কথা বললে তোমার ধুধ্বুরি ছুটিয়ে দেবে। তারপর ও নিজেই বলল রেশনটা দিয়ে আসছি। দিয়ে এসে বাবার ঘোড়ার গাড়িতে ধাক্কা লাগার গল্পটা বলল। কী সাংঘাতিক এই মেয়েটা।" রতন দেখছিল তার কথা শুনতে শুনতে বীণার মুখের ভাব বদলাচ্ছে। "আর বলল আপনি মহা কিপ্টে।"

"আর কী বলেছে?" থমথমে গলায় বীণা জানতে চাইল।

"আর কিছু না। কাকিমা বিশ্বাস করুন, গায়ে পড়ে ও আমাকে বলল রেশন পৌঁছে দেবে, এমন যে মিথ্যে বানিয়ে বলবে আমি জানতুম না। আমি ওর মজা বার করছি।"

উত্তেজিত রতন সদর দরজার দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা টাকা ছ' আনা বার করে বীণার হাতে দিল, "ফেরত পয়সা।"

"তুই শিবিকে চিনতিস?" রেজগি গুনতে গুনতে বীণা বলল।

"না।"

"খুব খারাপ মেয়ে, ওর মাটাও খারাপ। ভীষণ গায়েপড়া, খবরদার ওর সঙ্গে কথা বলবি না, বলতে এলেও বলবি না।"

বীণার রাগটা ঘুরে গেছে রতনের মনে হল, তাহলে এ বাড়ির দরজা তার জন্য বোধহয় খোলাই থাকবে। ওই শিবি মেয়েটাকে কাকিমা একদমই পছন্দ করে না। ওকে আচ্ছা করে কথা শোনালে কাকিমা নিশ্চয় খুশি হবে। কী কথা শোনাবে তাই ভাবতে ভাবতে রতন তরুণ পাঠাগারে পৌঁছল।

বড়জোর দশ-বারোজন বই পাল্টাতে আসে। দু ঘণ্টার বেশির ভাগটাই রতন বই পড়ে কাটায়। পড়ার ব্যাপারে তার বাছবিচার নেই। শরৎ গ্রন্থাবলীর মতোই মোহন সিরিজও সে গোগ্রাসে পড়েছে। পথের পাঁচালী যেমন তার ভাল লেগেছে, তেমন রবার্ট ব্লেকের ডিটেকটিভ কাহিনীও। নতুন যেসব বই কেনা হয়েছে তারই একখানা, সতীনাথ ভাদুড়ী নামে নতুন এক লেখকের 'জাগরী' নামের উপন্যাসটার আধখানা পড়া হয়েছে। বইটা সে লুকিয়ে রেখেছে র‍্যাকে অন্যান্য বইয়ের পিছনে, যাতে কারুর নজরে না আসে, দেখতে পেলেই তো চেয়ে বসবে। বাড়িতে সে বই নিয়ে যায় না, কাকা নাটক-নভেল পড়া পছন্দ করে না। পাড়ারই অধীরবাবু অনেকগুলো ছেঁড়া পুরনো বই দান করে গেছে, সেগুলো মেঝেয় পড়ে। রতনকে পাঠাগারের সেক্রেটারি বলেছে, ওর থেকে বেছে, আস্তগুলো রেখে দিয়ে, বাকি বই ফেলে দিতে।

বই লেনদেনের ফাঁকে সে মেঝেয় পড়ে থাকা বইগুলো থেকে বাছাবাছি করতে করতে একটা অভিধান পেল, বাংলা থেকে বাংলা। কার লেখা জানার উপায় নেই। প্রথম দিকের উনিশটা আর শেষের আটটা পাতা উইয়ে খাওয়া। এটা রেখে লাভ নেই, কোনও মেম্বারের অভিধান দরকার হবে না তাও আবার এমন নষ্ট হওয়া বই। বাড়িতে অভিধান নেই, রতন বইটা আলাদা করে রাখল। এটা সে নিয়ে যাবে। হোক ছেঁড়াখোঁড়া, অভিধান পড়তে তার ভাল লাগে। নতুন নতুন শব্দ জানা যায়, বানান ঠিক করে নেওয়া যায়। পরীক্ষার খাতায় তার বাংলা বানানের ভুল ধরে লাল কালির দাগ কোনও পরীক্ষক দিতে পারে না। আর সে সরিয়ে রাখল আধছেঁড়া একটা পৌরাণিক উপন্যাসের বই।

নিয়ম আছে পড়ার জন্য সাত দিনের বেশি বই রাখলে এক আনা জরিমানা দিতে হবে। বাচ্চা কাজের মেয়ের হাত দিয়ে বই বদলাতে পাঠিয়েছে পাড়ারই এক গৃহিণী। দশ দিন পর। রতন জরিমানা চাইতে মেয়েটি বাড়ি ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পর এক প্রৌঢ় এসে হাজির হল রাগে থমথমে মুখ নিয়ে।

"এই লাইব্রেরির যখন জন্মো হয় তখন দশ টাকা ডোনেট করেছি আর কি না আমার কাছ থেকেই ফাইন চাইছ ? তুমি তো সেদিনের ছেলে হে, জানো কবে থেকে আমি মেম্বার ?" লোকটি চেঁচিয়ে ঝগড়ার সুরে বলল। জরিমানা চাওয়ায় অপমানিত বোধ করেছে।

রতন বাদবিতণ্ডা এড়িয়ে চলতে চায়। মিনমিন করে বলল, "লাইব্রেরির যা নিয়ম আমি তাই বলেছি।"

"নিকুচি করেছে নিয়মের, দাও দাও যা বই চেয়েছে দিয়ে দাও।" স্লিপ খোঁজা বইটা টেবিলে আছড়ে ফেলল লোকটি। রতন স্লিপটা নিয়ে র‍্যাক থেকে বই খুঁজছে সেই সময় সে একটা আর্তনাদ শুনল, "রতু।"

রতন ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল দিদিকে। আলুথালু শাড়ি, দুটো চোখে আতঙ্ক। "বাবা দোকান বন্ধ করে বাড়ি আসছিল। লালার চায়ের দোকানের সামনে

রাস্তায় পড়ে গেছে।"

নিজের অজান্তেই রতনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুটে, "ঘোড়ার গাড়ির ধাক্কায় ?"

"অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। ওখানে যারা ছিল, তারা ট্যাক্সি করে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তুই শিগগিরি আয়, কাকা অফিস থেকে এখনও ফেরেনি।"

"কোন হাসপাতালে, আর জি কর-এ ?"

"হ্যাঁ, একটা ছেলে এসে খবর দিল।"

রতনের থরথর করে কাঁপা হাত থেকে বইটা মেঝেতে পড়ে গেল। জরিমানা দিতে না চাওয়া লোকটি বইটি তুলে নিয়ে নিচু স্বরে নরম গলায় বলল, "বন্ধ করে দাও লাইব্রেরি।...তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে যাও, যাও দেরি কোরো না। আর কাকাকে বলবে সঙ্গে যেন দু-তিনশো টাকা নিয়ে হাসপাতালে যায়।"

প্রায় দেড় মাইল দূরে হাসপাতাল। ট্রামের জন্য অপেক্ষা না করে রতন ছুটতে শুরু করল। খেলাধুলো করে না, অল্প ছুটেই হাঁফিয়ে পড়ল। কিছুটা জোরে হেঁটে আবার ছোটার চেষ্টা করল। এই সময় তার মনে পড়ল সকালে শিবির বলা কথাগুলো : 'একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে এসে বলল বাবা ঘোড়ার গাড়ির ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, শিগগিরি এসো।' আর দিদি এসে বলল : 'তুই শিগগিরি আয়, বাবা অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে গেছে, একটা ছেলে এসে খবর দিল।' দুজনের প্রায় একই কথা, কী অদ্ভুত মিল ! অনেকেরই অমঙ্গুলে কথা এই ভাবে মিলে যায়, হয়তো ওদের উপর কিছুর ভর আছে।

তিন

গুপিনাথ মারা গেল ভোরবেলায়। জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। সারারাত ওয়ার্ডের বাইরে বসে ছিল বিষ্ণুচরণ আর রতন। দুজনের মধ্যে সামান্যই কথা হয়।

"রতু খেয়ে আয়। বাইরের গেটের সামনে একটা মিষ্টির দোকান আছে।"

"খিদে নেই।...তুমি তো সকালে ভাত খাওয়ার পর আর কিছু খাওনি।"

"আমারও খিদে নেই।...সকালে লোকজন ডেকে আনতে হবে।"

"কেন ?...বাঁচবে না ?"

বিষ্ণু জবাব দেয়নি। কিছুক্ষণ পর সে বলে, "দোকানের চাবিটা কোথায় ?"

"আমার কাছে, বাবার পকেটে ছিল।"

"আর কী ছিল ?"

"একত্রিশ টাকা, বিক্রির, আর বাসি একটা জবা ফুল, পুজো দিয়ে মা

এনেছিল।"

"হার্টের রোগ অনেক দিনের, কাউকে কিছু বলেওনি, চিকিৎসাও করায়নি।...তোর সামনেই পরীক্ষা আর এই সময়ই—।" বিষ্ণু অন্যমনস্ক হয়ে চিন্তায় ডুবে গেল।

তিন দিন পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রতন স্যারের বাড়ি গেল। বাবার মৃত্যুর কথা সে এদের জানায়নি। তার কোরা ধুতি, কাছা, গলায় চাবি আর হাতে কম্বলের আসন দেখে বীণার হাত মুখের কাছে উঠে এল, "এ কি! কে মারা গেল?"

"বাবা। হঠাৎ হার্ট ফেল করে।"

রতনের কাছে সব খুঁটিয়ে শুনল বীণা। অনাথ উদ্বেগ জানাল, "ভাল করে পড়। এ বার থেকে তুই রোজ আয়, অঙ্কে তোকে ঠিক পাস করিয়ে দোব।"

বীণা বলল, "দ্যাখো তো, এতটুকু ছেলের ঘাড়ে কী বোঝা চাপল! বাপ থাকা মানে মাথার ওপর একটা চাল থাকা। যেমনই রোজগার করুক না কেন। এখন তো দিদির বিয়ে দিতে হবে, মাকে দেখতে হবে আবার পড়াশুনোও করতে হবে। কী যে দুর্ভোগে পড়লি।"

"কাকা আছে, কাকাই তো সব দেখে।"

"আজ আছে, বিয়ে থা করলে কি আর দেখবে? তুই তাড়াতাড়ি পাস করে চাকরি-বাকরির চেষ্টা দ্যাখ, নিজের পায়ে দাঁড়া।"

রতন নতমুখে শুনে গেল। স্যারের কাছে এক ঘণ্টা কাটিয়ে বই আর খাতা হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এসে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে সে ঢুকে পড়ল শিবিদের গলিতে। ওদের বাড়ির দরজাটা আধখোলা। ভিতরে ঢোকার সরু পথটা ইট বিছানো। সিমেন্টের ছোট উঠোন, দু-তিন জায়গায় ভাঙা। উঠোনের কিনারে নর্দমা, দেয়ালে জলের কল আর একটা চৌবাচ্চা। কলের মুখ থেকে একটা টিনের ডোঙা চৌবাচ্চার পাড় পর্যন্ত। দেয়ালে শ্যাওলা। তারে একটা শাড়ি আর ব্লাউজ ঝুলছে। কল থেকে জল পড়ছে টিনের বালতিতে। রতন এইটুকু মাত্র দেখতে পাচ্ছে। এ বার সে কী করবে? কোনও বাড়িতে গিয়ে একটা মেয়ের নাম ধরে ডাকলে সেই বাড়ির লোকেরা কী ভাববে! পিছনেই স্যারের শোবার ঘরের খোলা জানলা, কেউ যদি শুনতে পায়! তাছাড়া অপরিচিত একটা ছেলে এসে ডেকে কথা বললে শিবি বকুনিও খেতে পারে।

বরং থাক। পরে যখন দেখা হবে কোথাও তখনই নয় কথাটা বলবে। রতন ফিরে যাবে ঠিক করেছে তখনই একজন স্ত্রীলোক এসে কল বন্ধ করে বালতিটা তুলে ঘুরে দাঁড়িয়েই রতনকে দেখতে পেল। ভ্রূ কুঁচকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে? কাকে চাই?"

"শিবিকে।"

"শিবি?" অবাক হয়ে স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এল। "শিবির তো পান বসন্ত

হয়েছে, শুয়ে আছে। কী দরকার ওকে ?”

গলার স্বর নরম, বোধহয় তার অশৌচের চেহারাটা দেখেই। রতন ভরসা পেয়ে বলল, “এমনিই এসেছি, ওকে একটা কথা বলব বলে।”

“দাঁড়াও।...কী নাম তোমার ?”

নাম শুনে নিয়ে সে ঘরের দিকে চলে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর ফিরে এসে বলল, “এসো। ঘরের ভেতর ঢুকো।”

রতন আন্দাজ করল ইনি শিবির মা। বাড়িতে আর কোনও লোক সে দেখতে পেল না। একখানি শোবার ঘর, তার বাইরে টালিতে ঢাকা চাতাল, পাশে ক্ষুদ্র একটা টালির চালের ঘর, বোধহয় রান্নাঘর, চাতালে কুটনো কোটা ফেলে জলের বালতি আনতে গেছল শিবির মা, ফিরে এসে বঁটি নিয়ে আবার বসল। রতন শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়াল। মশারি বেঁধে গুটিয়ে তুলে রাখা ছত্রি লাগানো খাটে শিবি শুয়ে, সারা শরীর ঢাকা সাদা বিছানার চাদরে, মুখ দরজার দিকে ফেরানো। রতনকে দেখে শুকনো হাসল। ঘরের দুটো জানলাই বন্ধ, রতনের মনে হল ওর হাসিতে ঘরের আবছা ভাবটা যেন কেটে গেল।

“সেদিন বানিয়ে যা বলেছিলে তাই সত্যি হল।” রতন নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল, “বাবা এইভাবেই মারা গেল। রাস্তায় পড়ে যায় অজ্ঞান হয়ে।...সেইদিনই।”

শিবির চোখ ক্রমশ বড় হয়ে উঠল শুনতে শুনতে। বিছানায় সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই চাদরটা পড়ে গেল বুক থেকে। একটা ব্লাউজ পরে আছে, বোধহয় মায়ের, সামনের সব কটা বোতাম খোলা। সঙ্গে সঙ্গে রতন মুখ ঘুরিয়ে কুলুঙ্গির দিকে তাকাল। তার কান দুটো গরম হয়ে চোখে ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্ত পরই শিবি তাড়াতাড়ি চাদরটা বুকের সামনে তুলে ধরল।

“আমি !” শিবি আর কিছু বলতে পারল না, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত অসহায় চাহনি। মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

“তোমার কোনও দোষ নেই। এ রকম তো মিলে যেতেই পারে।” রতন ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

“পরদিন সকাল থেকেই আমার জ্বর হল।”

“বাবা মারা গেছে পরদিনই ভোরে, হার্ট ফেল করে।”

শোনা মাত্র অস্ফুট শব্দ করে শিবি চাদর দিয়ে মুখ ঢাকল। রতনের মনে হল একটা হেঁচকি তোলার মতো শব্দও সে শুনল। মা আর দিদি ছাড়া বাড়ির বাইরে এই প্রথম সে বাবার জন্য একটা শব্দ কাউকে করতে শুনল।

“আমি সত্যি সত্যি এ রকম কিছু ভেবে বলিনি, বিশ্বাস করো। মা কালীর দিব্যি...মজা করার জন্য বানিয়েছিলুম।” শিবির চোখে মুখে, কণ্ঠস্বরে মাপ চাওয়ার মতো করুণ আবেদন। দু চোখে অনুতাপ।

“মজা করতে তুমি দেখছি খুব ভালবাসো। কাকিমাকে গিয়ে সব বলে দিয়ে এসেছ ? আমি মিথ্যেবাদী বনে গেলুম।”

শিবির চোখে লজ্জা ফুটে উঠল। সেটা ঢাকতে কথা ঘোরাল, "এখন তুমি কী করবে ?"

"কী আর করব। সামনেই পরীক্ষা...পড়ব।" কুলুঙ্গির পাশে দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে রতন নিরাসক্ত স্বরে বলল।

ছবিতে তিনটি মানুষ। দুজনকে সে চিনতে পারছে। চেয়ারে বসে শিবির মা, যার সিঁথিতে সে প্রথমেই লক্ষ করেছে সিঁদুর নেই, বিধবা। তার কোলে বছর পাঁচ-ছয়ের শিবি, চোখ দেখেই সে চিনেছে। চেয়ারের পিছনে মাথার চুল ওঠা, কোট গায়ে ধুতি পরা লোকটা বোধহয় শিবির বাবা। দুজনের চোখের মধ্যে মিল আছে। এ রকম কোনও ছবি তাদের ঘরে নেই। সাঁতারের কস্টিউম পরা গুপিনাথের একটা ছবি ছোটবেলায় সে দেখেছিল মায়ের তোরঙ্গে।

ছবিটার দিকে রতনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে শিবি বলল, "আমি মা আর বাবা। আমার আট বছর বয়সে বাবা মারা যায়, লিভার পচে গেছল।" একটু থেমে বলল, "খুব মদ খেত।"

রতন অপ্রতিভ বোধ করল। মদ তো খারাপ চরিত্রের লোকেরা খায়। বাবার সম্পর্কে এমন কথা বাইরের লোককে বলা ঠিক নয়। শিবির রাখঢাকটা কম, কাকে কী বলতে হয় জানে না।

"কর্পোরেশনে কাজ করত, খুব সৌখিনও ছিল। এই দেখো না রেডিও কিনেছিল।" বাবার কথা বলতে গিয়ে শিবির চোখে আলো ফুটে উঠল। রতন দেখল ঘরের এক পাশে ছোট একটা টেবিলের উপর রেডিও।

রতন চুপ করে রয়েছে। গুপিনাথ খুব রোজগার করত না, খুব সৌখিনও ছিল না। শিবির কথা তার ভাল লাগছে না। নিজে একাই কথা বলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে শিবি কথা বন্ধ করল। দুজনেই চুপ। সেই সময় শিবির মা ঘরে ঢুকে খাটের তলা থেকে পানের বাটা বার করল। অনেকগুলো সাজা পানের খিলি থেকে একটা মুখে দিল তারপর এক চিমটে জর্দা। সে লক্ষ করল শিবির মা বেশ কম বয়সী, মেয়ের মতো অত কালো নয়। সাদা শাড়িটা ধবধবে। গলায় সরু সোনার চেন। ঠিক বিধবার মতো দেখতে লাগছে না।

"তোমাদের বাড়িতে আর কে কে আছে ? নিজেদের বাড়ি ?" পান চিবোতে চিবোতে শিবির মা জানতে চাইল।

"ভাড়া বাড়ি। আছে মা দিদি আর কাকা।"

"কী জাত তোমরা ?"

"বামন।"

"পড়ো ?"

"হ্যাঁ, ম্যাট্রিক দোব।"

"বাবা কী করত ?"

"চায়ের দোকান আছে।" বলেই দ্রুত যোগ করল, "খুব ছোট দোকান।"

তার মনে হল শেষের কথাটা বলার দরকার ছিল না।

"কে এবার দোকান দেখবে, তুমি, না কাকা?"

"জানি না।"

"কাকা কী করে?"

"চাকরি করে..ট্রাম কোম্পানিতে।"

"শিবির অসুখটা ছোঁয়াচে, তুমি আর এখানে থেকো না।" কথাটা বলে শিবির মা পিক ফেলার জন্য রতনের গা ঘেঁষে ঘর থেকে বেরোল। সে সাবানের মিষ্টি গন্ধ পেল। রতন অপ্রতিভ বোধ করল এইভাবে সোজাসুজি তাকে চলে যেতে বলায়। শিবির দিকে তাকিয়েই সে চোখ নামিয়ে নিল। বুকের সামনে তুলে ধরা চাদরটা নামিয়ে ব্লাউজের টেপা বোতাম লাগাচ্ছে শিবি।

"আমি আসছি।"

"আবার আসবে?" শিবির স্বরে আন্তরিকতা রয়েছে। রতনের মনে এল ওর মার কথা বলার ভঙ্গি। ইতস্তত করে সে বলল, "দেখি। এখন তো শ্রাদ্ধের জন্য অনেক কাজ রয়েছে, পরীক্ষার পড়াও আছে...চলি।" সে আর শিবির দিকে তাকাল না। শরীরের মধ্যে রক্তপ্রবাহের বেগ বদল হয়ে নতুন একটা উত্তেজনা তাকে ঝাঁঝিয়ে তুলছে।

শিবিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর তার চোখে ভেসে উঠল রমলা লাহিড়ি আর তার মা। হাবভাবে, কথায়বার্তায়, উচ্চারণে, চেহারায়, সাজে কত তফাত! সারা পথ দু জোড়া মা-মেয়ের মধ্যে তুলনা করতে করতে সে বাড়ি পৌঁছল। মায়ের সঙ্গে কাকা কথা বলছে। আত্মীয়কুটুম কাদের নিমন্ত্রণ করা হবে তারই তালিকা তৈরিতে ওরা ব্যস্ত। বলছে কাকা, শুনছে মা।

"এত লোককে বললে তো খরচে কুলোতে পারব না। জ্যাঠাদের সঙ্গে তো কোনও সম্পর্কই নেই, জেঠিমা মারা যাবার দুদিন পর খবর দিল, এই তো আত্মীয়তার নমুনা, এখান থেকে মানিকতলা আর কদ্দূর, তবু দু দিন লাগল! দরকার কী ওদের বলে। বললেও দেখবে হয়তো কেউ আসবে না।...একটা কথা বউদি, এখন থেকে কিন্তু মেপে হিসেব করে চলতে হবে, সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় তো আর দেওয়া যাবে না। বাজে খরচ একদম বন্ধ। বারাসাতে তোমার ভাইকে কি বলার দরকার আছে? রতু...তোর স্যারকে কি বলতে হবে?"

বিষ্ণুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে রতন বলল, "বললে ভাল হয়।"

"আচ্ছা।" হাতের কাগজে বিষ্ণু নামটা লিখল। "শ্মশানবন্ধুদের তো বলতেই হবে। ওরা ছাড়া সামনের বলাইবাবুদের, বেঁটে কেলোদের আর শম্ভু ঘোষদের...এই তিনটে বাড়ি। পাড়ায় যাতায়াত, কথাবার্তা তো শুধু এদেরই সঙ্গে।"

ক্ষীণস্বরে উমারানি বলল, "বারাসাতের ওরা তো মারা যাবার খবরই

পায়নি। রতু একবার যাক না।”

“না, না, ওর সামনে পরীক্ষা এখন একটা দিনও নষ্ট করা উচিত হবে না, বরং আমি একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিচ্ছি, আর হ্যাঁ, ওপরে ওদের তো বলতে হবে।”

ওপরের ওরা হল বাড়িওয়ালি বুড়ির দূরসম্পর্কের ভাইপো এবং তার পরিবার। বুড়ি যখন মরোমরো তখন কোতরং থেকে হঠাৎ এসে আবির্ভূত হয় এই ভাইপো দুলাল চাটুজ্যে। শেষের কটা দিন সেবাযত্ন করেছিল। অথচ রতনরা শুনেছিল বুড়ির তিন কূলে নাকি কেউ নেই! দুলালের সঙ্গে আসে বউ নমিতা আর স্বামী পরিত্যক্তা বোন অন্ন, ভাল নাম অন্নপূর্ণা, কৈশোরে বসন্ত রোগে অন্নর মুখখানি শুধু বাটনা বাটা শিলের মতো গর্তে ভরিয়ে দিয়েই যায়নি একটি চোখও নষ্ট করে দিয়ে গেছে। দুলালদের সন্তান নেই তবে হতে পারে, দুজনেরই বয়স অল্প। লোকটি নম্র, মিষ্ট স্বরে কথা বলে, রতনের সন্দেহ জাঁহাবাজ এবং সুযোগসন্ধানী, নয়তো পিসিমা মরতে চলেছে এই খবরটা পেল কী করে? দূর থেকে নিশ্চয় নজর রেখেছিল। জমিজমা পুকুর আছে, প্রতি শনিবার সে সব তদারক করতে যায়।

রতন দুপুরে ভূগোল পড়তে বসল। অঙ্ক, সংস্কৃত আর ইংরিজিতে সে কাঁচা। তাই এই তিনটি বিষয়েই সে এতদিন মন দিয়েছিল। এখন ভূগোল বই খুলে তার মনে হচ্ছে এই বিষয়টার কিছুই সে জানে না। বায়ুপ্রবাহের শ্রেণীবিভাগকে ভূগোলের স্যার ‘ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট’ বলেছিলেন। রতন বায়ুপ্রবাহের চারটি শ্রেণী—নিয়ত, সাময়িক, আকস্মিক ও স্থানীয়, কয়েকবার পড়েও মনে রাখতে পারছে না অথচ মুখস্থ সে ভালই করে। দু-তিন লাইন চোখ বুঁজে বিড়বিড় করার পরই ছবির মতো চোখে ফুটে উঠছে চাদর ফেলে শিবির বিছানায় উঠে বসার দৃশ্যটা। সিনেমার রিপ্লের মতো বারবার ছবিটাকে এগিয়ে পিছিয়ে অবশেষে এক জায়গায় সে স্থির করিয়ে রাখে। আট-দশ সেকেন্ড পর লজ্জায় মনে মনে কুঁকড়ে গিয়ে সে মাথা ঝাঁকিয়ে ছবিটাকে মুছে দেয়। এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা উচিত নয়, কেউ না জানলেও সে নিজে তো জানে সে একটা অপরাধ করছে। শিবি তো ইচ্ছে করে চাদরটা সরায়নি। অমন একটা খবর শুনে যে কেউই ধড়মড় করে উঠে বসত। সে নিজেও তো চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। দোষ কারুরই নেই। তবু ওই সামান্য সময়টুকতেই যা সে দেখতে পেয়েছিল সেটা তার শরীরের কোষগুলোয় বিদ্যুৎ ছুঁইয়ে ঝাঁকিয়ে দেয়। সে অবশ হয়ে গিয়েছিল, সাড় ফিরে আসার পরই শরীর জ্বালা করে ওঠে। জ্বালাটা এখনও চলছে। বই বন্ধ করে সে খাটে শুয়ে পড়ল শরীরটাকে গুটিয়ে বুকের কাছে হাঁটু তুলে। চোখ বুজে সে মনে করতে চেষ্টা করল বায়ুপ্রবাহের চারটি শ্রেণী। একটু পরেই রতন ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যায় সে তরুণ পাঠাগারে গেল। এই কদিন লাইব্রেরির কাজ করছে অমলেন্দু, গুপিনাথের শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত করবে। মেম্বারদের জন্য ছোট

বেঞ্চটায় বসে রতন একটা পাণ্ডুলিপি পড়ছিল। লাইব্রেরি থেকে হাতে লেখা একটা পত্রিকা বেরোয়। নাম 'পূর্বাচল', বছরে তিনটে বেরোত, এখন দুটো। পুরু কারটিজ কাগজে, রেক্সিন বাঁধাই, মলাটে সোনার জলে লেখা 'পূর্বাচল'। মেম্বাররা ছাড়াও বাইরের লোকেদেরও রচনা এতে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া বিখ্যাত লেখকদের উৎসাহ দেওয়া কয়েক লাইনের আশীর্বচনের মতো তাঁদের স্বহস্তে লেখা শুভেচ্ছাও লিখিয়ে নিয়ে আসা হয়। গত বছর তারাশঙ্করের শুভেচ্ছা আনতে তার টালার বাড়িতে যে তিনজন গেছিল তার মধ্যে রতনও ছিল। সে লাইব্রেরিতে রাখা 'কালিন্দি' আর 'ধাত্রীদেবতা' পড়েছে। তারাশঙ্কর যখন পূর্বাচলের পাতা উল্টে লিপিকারের হাতের লেখার প্রশংসা করে বলেন, 'বাঃ কী সুন্দর', তখন রতন আনন্দে পাথর হয়ে গেছিল। 'পূর্বাচল' আগাগোড়া তারই হাতে লেখা। 'মুক্তোর মতো' অক্ষরে এবং নির্ভুল বানানে লেখার জন্যই সে নাকি পরীক্ষায় কয়েকটা নম্বর বেশি পায়, এমন একটা কথা তার সহপাঠীদের মধ্যে চালু আছে। তারাশঙ্কর সেদিন পাঁচ লাইন লিখেছেন, দেখে রতন বলেছিল, 'হিরের মতো হাতের লেখা'।

রতন লাইব্রেরিতে বসে পড়ছিল যে প্রবন্ধটি তার শিরোনাম : 'জীবনানন্দ ও প্রকৃতি'। কে এই জীবনানন্দ জানার জন্য রতন যখন অমলেন্দুকে প্রশ্ন করবে বলে মুখ তুলল, তখন সে একজন মেম্বারের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত। রতন শুনল অমলেন্দু ঈষৎ গদগদ করে বলছে, "গৌর তা হলে শিগগিরি ফিরছে না ?"

"এই তো সবে এক বছর হল গেছে। হামবুর্গ কি ভবানীপুর যে এ বেলা-ও বেলা যাতায়াত করা যায় ? প্লেন ভাড়াই তো পাঁচ হাজার টাকা।"

"চিঠিপত্তর দেয় ?"

"দেবে না কেন ! আগে হপ্তায় হপ্তায় দিত এখন মাসে একটা দেয়। প্রচণ্ড কাজের চাপ। আমেরিকানরা বোমা ফেলে তা আর কিছু আস্ত রাখেনি। সব তৈরি করতে হচ্ছে। রাস্তাঘাট, বাড়ি, কলকারখানা নতুন করে তৈরি হচ্ছে, লাখ লাখ লোক ওদের দরকার, ইটালি থেকে গ্রিস থেকে, টার্কি থেকে ঝেঁটিয়ে লোক গেছে। জার্মানিতে ইয়াং বলে তো আর কিছু নেই, তারা তো সব যুদ্ধেই মারা গেছে !...আচ্ছা চলি।"

"নিতাইদা একটা কথা।" অমলেন্দু কাতর গলায় বলল, "গৌরের কাছ থেকে চিঠি দিয়ে একটা খবর জেনে নেবে, ওখানে এখন চাকরি দেওয়া হচ্ছে কি না ?...ছোট ভাইটা আই এস সি পড়ছে, ওকে তা হলে পাঠিয়ে দোব, এখানে থেকে কতদূর আর কী করতে পারবে ? তবু জার্মানি থেকে কিছু শিখেটিখে এলে একটা ভাল চাকরি পাবে, এখন তো অনেক বড় বড় কলকারখানা হচ্ছে, বাঁধ হচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি—"

"আরে রেখে দাও ও সব বড় বড় কলকারখানা। মাইনে কত দেবে ? সেই তো পাঁচশো-বারোশো স্কেলে ! গৌর কত পাচ্ছে জানো ?...হপ্তায় আড়াই

হাজার টাকা !"

রতন লোকটার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। হপ্তায় এত টাকা মাইনের কথা কারুর মুখ থেকে সে এই প্রথম শুনল। অমলেন্দুর দুটো চোখ ছলছল করছে। গাঢ় স্বরে বলল, "জানি এ দেশে কিছু হবে না, কোন প্রসপেক্ট নেই। আই এ পড়তে চেয়েছিল জোর করে আই এস সি-তে ভর্তি করিয়েছি। সায়েন্স পড়লে তবু...এখন তো সায়েন্সেরই যুগ !"

"তা তো বটেই। তবে গৌর তো কলেজে পড়েনি। স্বাস্থ্য ভাল, ওয়েট লিফটিং করত, খুবই ড্যাশিং, জার্মানরা তো এটাই চায়। ওরা খাটিয়ে জাত তাই খাটিয়ে লোক পছন্দ করে...আচ্ছা চলি।"

"আমার ভাইও খুব খাটিয়ে...নিতাইদা ওর কথাটা গৌরকে কিন্তু মনে করে লিখবেন ?"

"লিখব।...চলি।"

লোকটি চলে যাবার পর রতন বলল, "অমলেন্দুদা, এই গৌর কে ?"

"কে আবার, একটা বখাটে ছেলে। স্বাস্থ্য সমিতিতে একসারসাইজ করত আর খোকার চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিত। কী করে যে জার্মানি চলে গেল সেটাই ভাবি।...হপ্তায় আড়াই হাজার কামাচ্ছে, একটা আকাট মুখ্যুকে জার্মানরা অত টাকা দেবে, বিশ্বাস করতে হবে ?"

"আড়াই হাজার না হোক দু হাজার হয় তো দেয়।"

"তুই জানিস, দেয় ?" ধমকে উঠল অমলেন্দু।

রতন মনে মনে গুটিয়ে গেল, হাতের কাগজগুলো ভাঁজ করে বলল, "পরীক্ষা চুকে গেলে এগুলো নোব। রেখে দিন এখন।"

ইস্যু করা বইয়ের নাম খাতায় লিখছে অমলেন্দু। রতন দাঁড়িয়ে রইল।

"পাস করে সায়েন্স পড়িস আর এই প্যাংলা শরীরটাকে তাগড়াই কর। অন্যের লেখা পূর্বাচলে লিখে তোর লাভটা কী হবে ?...টেবিলে রেখে যা।" অমলেন্দু আঙুল দিয়ে দেখাল। মুখে বিরক্তি।

রতন কাগজগুলো টেবিলে রাখল। সে বলতে গিয়েও বলতে পারল না, তারাশঙ্কর তার হাতের লেখা দেখে 'বাঃ কী সুন্দর' বলেছিলেন। এর কি কোনও মূল্য নেই ? লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল নিতাইয়ের কথাটা : 'গৌর কত পাচ্ছে জানো ? হপ্তায় আড়াই হাজার টাকা !' খোকার চায়ের দোকান সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর ওপারে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের মোড়ে। ওদিকটায় সে বিশেষ যায় না, পাড়াটা খারাপ। দু ধারে বেশ্যাবাড়ি। খোকার দোকানের সামনে একটা বেঞ্চি পাতা। সব সময়ই তাতে লোক বসে থাকে। দোকানটা থেকে একটু গেলেই স্বাস্থ্য সমিতি। কোলাপসিবল গেট, তারপর একটা ঘর তাতে ছড়ান রয়েছে ব্যায়ামের সরঞ্জাম। সেটা পেরিয়ে একটা স্প্রিং দেওয়া আধা-দরজা ঠেলে ঢুকলে মাটির জমি। এখানেও প্যারালাল বার, রিং ইত্যাদি। রতন কোলাপসিবল গেটের

বাইরে থেকে কিছু ছেলেকে ব্যায়াম করতে দেখেছে।

অমলেন্দুর কথা থেকে সে বুঝেছে গৌর নামের লোকটা লেখাপড়া করেনি। ছিল শুধু স্বাস্থ্য আর ড্যাশিং। ড্যাশিং-পুশিং কথাটা সে শুনেছে, মানেটা ঠিকমতো জানে না। রতন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে খোকার চায়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে রইল। স্বাস্থ্য সমিতির কোলাপসিবল গেটটাও দেখা যাচ্ছে। ভিতরে আলো জ্বলছে। খোকার দোকানের বেঞ্চে চারটে লোক বসে, একজনের হাতে চায়ের গ্লাস। তার পাশেই একটা দোকান। সামনে দিয়ে গেলে কাচের শো-কেসে লাল লঙ্কা মাখানো ভাজা কাঁকড়া, ডিম আর আস্ত মুরগি দেখা যায়। দেখলে জিভে জল আসে। রাস্তায় কয়েকটা রিক্সা, কিছু লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। দোতলার বারান্দা চিক ফেলা। একটা ট্যাক্সি এসে থামল। রকে বসেছিল দুটো লোক। একজন এগিয়ে গেল ট্যাক্সির দিকে। জায়গাটা শান্ত। রাত বাড়লে লোক বাড়বে। কয়েকদিন আগে সে শুনেছে রাতে এখানে সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছিল।

হপ্তায় আড়াই হাজার টাকা। রতন সন্তর্পণে একটা বাসনার মধ্যে ঢুকে পড়ল—জার্মানি যাওয়া যায় না? ওই বেঞ্চিতে বসে আড্ডা দেওয়া একটা ছেলে, যদি ওই স্বাস্থ্য সমিতিতে লোহার চাকা তুলে জার্মানি যেতে পারে তা হলে সেও কী পারবে না? প্লেনেই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে, কত লোক তো জাহাজে খালাসির চাকরি নিয়ে বিলেতে গেছে। সহায়সম্বলহীন হয়ে বিদেশে ভিক্ষে করে খেয়েছে, ফুটপাথে ঘুমিয়েছে। তারপর এক দিন অনেক কিছু শিখে দেশে ফিরে বিরাট লোক হয়েছে। শুধু একবার কোনওভাবে গিয়ে পড়া। পরিশ্রম করতে তো হবেই, তাতে সে ভয় পায় না শুধু তাগড়াই হতে হবে। স্বাস্থ্য সমিতিতে ভর্তি হলে মোটামুটি একটা চেহারা তৈরি করতে কত দিন লাগবে? রতন তার পাড়ায় ব্যায়াম করা লোক দেখেনি।

হপ্তায় আড়াই হাজার টাকা দিয়ে গৌর করে কী? বাড়িতে নিশ্চয় টাকা পাঠায়। সেও পাঠাবে। নিশ্চয় গাড়ি কিনেছে। ছ মাস থাকলেই নাকি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কেনার পয়সা জমানো যায়। টাকা জমিয়ে কিংবা ধার করে প্রথমে বম্বে যেতে হবে, ওখান থেকেই জাহাজ ছাড়ে, টাকা আর কী করে জমাবে, চাকরিবাকরি তো আর সে করে না, শ'খানেক টাকা ধারই করতে হবে। কার কাছে ধার পাওয়া যাবে?...কাকা?

রতন বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। কাকার কাছে কি একশো টাকা এখন চাওয়া যায়? সামনেই শ্রাদ্ধ, দিদির বিয়ের জন্য ছেলে খোঁজা হচ্ছে, খরচ তো কাকারই। কত টাকাই বা মাইনে পায়! সে জানে না, তবে আন্দাজে মনে হয় দেড়শোর মতো। যদি কাকা বিয়ে করত তা হলে দাদার সংসারের জন্য কি টাকা দিত? এখনও বিয়ে করতে পারে যদি করার ইচ্ছে হয়। পাড়ার তারক

দত্ত তো তৃতীয়বার বিয়ে করল। প্রথম বউ গায়ে আগুন দিয়ে মরল, দ্বিতীয় বউ কার সঙ্গে পালিয়ে গেল। তারক আর কাকা একই বয়সী। রতন অস্বস্তি বোধ করল এই ভেবে যে সে একটা অনুচিত চিন্তা করছে। কাকা যেন বিয়ে না করে।

বাড়িতে এসে রতন মা ছাড়া কাকা বা দিদিকে দেখতে পেল না। উমা রান্নাঘরে চুপ করে বসে, উনুনে কী একটা ফুটছে। রতন জিজ্ঞাসা করল, "দিদি কোথায় মা ?"

"মানু ওপরে।"

রতন উঠোনে দাঁড়িয়ে দোতলার দিকে তাকিয়ে দেখল ঘরের দরজা বন্ধ, জানালাটাও। ঘরে আলো জ্বললে কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। তার মনে হল আলো জ্বলছে না। অন্ধকার ঘরে দিদি কী করছে ? কৌতূহলী হয়ে সে পা টিপে টিপে দোতলায় উঠল। ঘরে রেডিওতে নাটক হচ্ছে, কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। সে নেমে এল। বাড়িতে একজন মারা গেছে, শোকের বাড়ি। তাই নাটক শুনছে দরজা-জানলা বন্ধ করে, কেউ যেন না জানতে পারে। দুলাল চাটুজ্জেদের শোক হবার কথা নয় কিন্তু দিদির তো হবার কথা।

ইংরিজি বই নিয়ে রতন পড়তে বসল। মিনিট খানেক পরই সে বুঝে গেল সে কিছুই পড়ছে না। তার চোখে ভেসে রয়েছে জার্মানির মিউনিখ শহরের একটা ছবি। জার্মান কনসুলেট থেকে লাইব্রেরিতে পাঠায় পত্রিকা, ইস্তাহার। তারই একটায় দেখেছিল রাজপথের ছবি, বড় বড় বাড়ি, চকচকে মোটরগাড়ি, দু ধারে ঝলমলে দোকানে কাচের দরজা, তকতকে চওড়া ফুটপাথে হেঁটে যাচ্ছে এক তরুণের বাহু ধরে এক তরুণী, পেরাম্বুলেটরে বসিয়ে মা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাকে যার গাল দুটো আপেলের মতো। ওদের দু ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে ব্যস্ত নরনারী। তার মধ্যে রয়েছে—ছড়ি হাতে টুপি মাথায় এক বুড়ো আর মাথায় রুমাল বাঁধা এক বুড়ি। দুজনে হাত ধরে রয়েছে দুজনের। রতনের ইচ্ছে করছে অমন একটা জায়গায় গিয়ে বাস করতে। বইটা চোখের সামনে ধরে রেখে সে নিজেকে দেখল মিউনিখের ওই রাজপথে হেঁটে চলেছে। একটা ক্ষীণ সুখের হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। তখনই বাইরে কাকার গলার আওয়াজ পেল।

"রতু পড়তে বসেছে বউদি ?"

উমা কী যেন বলল। রতনের চোখ থেকে মুছে গেল মিউনিখ। পলকের জন্য তার মনে হল, বাবার মৃত্যুর জন্য কোথায় শোক ? গত ছ-সাত ঘণ্টায় একবারও তো তার বাবাকে মনে পড়েনি। দিদিরও বোধহয় মনে করে রাখার আর দরকার হয় না। মার মনের মধ্যে কী হচ্ছে সে বুঝতে পারে না। কথা এমনিতেই কম বলে, একই নির্বিকার মুখ নিয়ে সংসারের কাজ করে যাচ্ছে। কাকা আগের মতোই রয়ে গেছে শুধু কপালের কোঁচকানিটা বেড়েছে।

মানসী উপর থেকে নেমে এল বিষ্ণুর গলার আওয়াজ পেয়ে। তাকে দেখে

রতন বলল, "নাটক শুনছিলি ? কী নাটক ?"

"শাজাহান।"

"গুরুদশার সময় কেউ নাটক শোনে না।"

"তোকে ডেঁপোমো করতে হবে না, নিজের পড়া পড়, কদিন পরেই পরীক্ষা।"

রতন বইয়ে চোখ রাখল। কথাটার উত্তর দিলে ঝগড়ার মতো একটা ব্যাপার তৈরি হবে। সেটা সে চায় না। সবার মতো সেও তো কোনওরকম শোক বোধ করছে না। বেঁচে থাকতেই তারা বাবাকে তো একটা লোক ছাড়া আর কিছুই ভাবত না। এমন অনেক দিন গেছে, বাবার সঙ্গে কথা বলার কোনও দরকার বোধ করেনি। বাবাকে ভালবাসত কি না সেটা এখনও সে জানে না। শ্মশানের পুরুতের নির্দেশে বাবার মুখে যখন সে ঘি মাখিয়ে দিচ্ছিল তখন ঘিনঘিন করে উঠেছিল তার ভিতরটা। হতে পারে ঘিয়ের গন্ধ তার ভাল লাগছিল না।

"দিদি, বাবাকে ভালবাসতিস ? বুকে হাত দিয়ে বল।" রতনের মুখ থেকে অজান্তেই যেন কথাটা বেরিয়ে এল।

মানসী অবাক হল প্রশ্নটা শুনে। মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। "হঠাৎ এমন কথা ?"

"এমনিই।"

"নাটক শুনতে গেছি বলে ?"

"না, না, এমনিই মনে হল। ফাঁকা ফাঁকা লাগার কথা। কিন্তু লাগছে না। তোর লাগছে ?"

"একটু একটু লাগছে। একসঙ্গে জন্ম থেকেই রয়েছি তো।...ছিলুম তো। ছেলেরা অন্যরকম হয়।"

"কেন হয় !" রতনের স্বরে জিজ্ঞাসা নেই।

চার

শ্রাদ্ধ চুকে গেল। কোনও সমারোহ ছিল না। উমা একবার মৃদুস্বরে বলেছিল, "একটু কেত্তন হলে ভাল হয়।" কথাটা কেউ কানে নেয়নি। শ্রাদ্ধবাসরে সকাল থেকে কীর্তন হতে দেখেছে রতন। মৃতের ছবি মালা পরিয়ে সেখানে রাখা হয়। রজনীগন্ধার ছড় আর বেলফুলের মালায়, ডেকরেটবের পর্দায় আসর সাদা হয়ে থাকে। রতনের একবার মনে হয়েছিল, তোরঙ্গে রাখা বাবার ছবিটা শ্রাদ্ধের সময় দানসামগ্রীর মাঝে বসিয়ে রাখবে। পরে মনে হয়, সাঁতারের কস্টুম পরা লালচে হয়ে যাওয়া ছবিটা ভীষণ বেমানান হবে। কাচ বাঁধানো, চন্দনের ফোঁটা দেওয়া ছবি ছাড়া মানায় না। সরু সরু দুটো পা আর দুটো হাত ছাড়া ছবিটায় আর কিছু দেখার নেই। বারাসাত থেকে

রতনের মামা আসেনি, হাঁপানিটা বেড়ে যাওয়ায়। মামি আর তারই বয়সী ধুতি পরা মামাতো ভাই এসেছিল। ছেলেটি এগারো ক্লাসে পড়ে। রতনেরও ওই ক্লাসে পড়ার কথা কিন্তু অষ্টম শ্রেণীতে ফেল করায় তা হয়নি। তবে স্কুলে এক বছর বয়স কমানো আছে। মামা একশো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে উমাকে। জনা কুড়ি লোক নিয়মভঙ্গের পর দুপুরে খায়।

দিন দুয়েক পর বিষ্ণু অফিস থেকে ফিরে উমাকে বলল, "বউদি আজ একটা পাত্রের খোঁজ পেলুম।"

"এখনই ? অশৌচের একটা বছর যাক।"

রতন তখন ঘরে বসে পড়ছে। মানসী বালিসের ওয়াড় খুলছিল সাবান জলে সিদ্ধ করার জন্য। উমা তাকে বলল, "পরে খুলবি, আগে আটাটা মেখে রাখ।" বালিশ রেখে মানসী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বিষ্ণু শার্টটা খুলল। রতন আর উমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

এক বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। খোঁজাখুঁজি এখন থেকেই শুরু করতে হবে। কথা পাকা হতে হতে বছর ঘুরে যাবে। আমারই কলিগ প্রমথর পাড়ায় ওরা থাকে বেহালায় ঢালিপাড়ায়। নিজেদের বাড়ি, বনেদি পরিবার, খুলনায় বাড়ি ছিল।"

"পূর্ব্ববঙ্গের !" উমার গলায় ধাক্কা পাওয়ার সুর ক্ষীণভাবে ফুটল।

"তাতে কী হয়েছে ?" বিষ্ণুর স্বরে বিরক্তি। "যশোর খুলনা আবার পূর্ব্ববঙ্গ হল কবে ? বাঙাল তো পদ্মার ওপারের লোকেরা।...বাঙাল-ঘটি সেন্টিমেন্ট নিয়ে এখন আর চলবে না।" শেষের কথাটা ধমকের মতো শোনাল। "শিক্ষিত ঘর, চার ভাই, পাত্তর ছোট ছেলে, বাবা নেই। মেজভাই রাইটার্সে বড় পোস্টে আছে হোম ট্রান্সপোর্টে। বড় ভাই দিল্লিতে সেন্ট্রাল গভরমেন্টে, সেও বড় পোস্টে। আর সেজ ভাই বেহালাতেই ওষুধের দোকান করেছে, ভাল চলে। তিনজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে।"

"বোন-টোন নেই ?" উমা জানতে চাইল। রতন ব্যগ্র পাত্র কেমন জানার জন্য। বয়স কত, দেখতে কেমন, করে কী ? কাকার উচিত তো গোড়াতেই সে কথা বলা। তা নয়, নিজের বাড়ি, বনেদি পরিবার, এই সব কথা শুরু করল।

"দুই বোন, বড়র বিয়ে হয়েছে জামসেদপুরে, স্বামী সুপারভাইজার। ছোট বি.এ পড়ে। খুবই শিক্ষিত পরিবার শুধু এই ছেলেটিরই লেখাপড়া তেমন হয়নি।" বিষ্ণু চুপ করে গেল। ওরা দুজন অপেক্ষায় রইল আবার বিষ্ণুর মুখ খোলার জন্য।

"ক্লাস নাইনের পর আর পড়েনি। মেজ ভাই ভেতর থেকে ধরে টরে স্টেট ট্রান্সপোর্টে চাকরি করে দিয়েছে। চাকরিটা এমন কিছু নয় তবে ওর মেজদা চেষ্টা চরিত্তির করে একটা ভাল জায়গায় নিয়ে যাবে।"

"এখন কী চাকরি করে ?" রতন কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। বিষ্ণু বিরক্ত চোখে তাকাল। "কন্ডাক্টারি।"

"কন্ডাক্টারি !" রতনের স্বরে হতাশা। উমা স্থির চোখে বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে।

"ঠিক জানি না কত পায়, একশো পাঁচ-দশ হবে বোধহয়। খারাপ কী এমন ? চাকরির বাজারের যে কী অবস্থা আমি তো জানি। কত বি.এ এম.এ এই কন্ডাক্টারির চাকরির জন্যই জুতোর শুখতলা খইয়ে ফেলছে।...ভেতরে দাদা রয়েছে দু বছরের মধ্যেই টিকিট চেকার হয়ে যাবে।" বিষ্ণু দুজনের মুখের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলল প্রতিক্রিয়া জানতে। ওরা চোখ সরিয়ে রাখল।

"এর থেকে ভাল পাত্তর পেতে হলে বিশ-পঁচিশ হাজার খরচ করতে হবে,...টাকা কোথায় ? আর আমার আনা সম্বন্ধ যদি পছন্দ না হয় নিজেরা তা হলে দ্যাখো।" ঝাঁঝালো গলায় বলে বিষ্ণু উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মানসী বলল, "মা কটা রুটি হবে ?"

"দাঁড়া আমি যাচ্ছি।" উমা ঘর থেকে বেরোল। রতন দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। প্রতিবেশীরা, চেনাশোনা লোকেরা যখন জানতে চাইবে ভগ্নিপতি কী করে, তখন বলতে হবে, বাস কন্ডাক্টর। হোক না স্টেট বাসের, তবু কন্ডাক্টর তো। ময়লা খাকি ঘামে ভেজা জামা পরা, প্রায় ছেঁড়া চটি পায়ে একটা ভিড় ঠাসা বাসের মধ্যে কোনওক্রমে ঠেলেঠুলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, মুখের কাছে হাত বাড়িয়ে 'টিকিট', ঘণ্টা বাজিয়ে বাস থামাচ্ছে, কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ ঝাঁকিয়ে রেজগি গুনে পয়সা ফেরত দিচ্ছে—রতনের চোখে এমন একটা ছবি ভেসে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুকের ভিতর থেকে। সে জানে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা তাদের নেই, কেউ তাদের ধারও দেবে না। কাকা কত আর করবে ! দাদার সংসার টানার কথা তো ওর নয়। রতন কাকার কোনও দোষ খুঁজে পেল না কন্ডাক্টার পাত্রের খবর আনার জন্য। বাবা তো একটা অচল দোকান রেখে গেছে। মারা যাবার পর থেকে সেটা তালা বন্ধই রয়েছে। কে চালাবে দোকান ? ওটা বিক্রিই করে দিতে হবে। দিদির বিয়ের খরচ তাতে খানিকটা মিটবে। রতন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ভেবে চলল। পাশের ঘরে বিষ্ণুর সঙ্গে উমা কথা বলছে। কথার অস্পষ্ট শব্দ তার কানে আসছে।

একটু পরে উমা ঘরে এল।

"আমি হ্যাঁ বলে দিলুম। এর থেকে ভাল আর কী জুটবে। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে দিদির বিয়ে দিতে দিতে মানু তদ্দিনে বুড়ি হয়ে যাবে।"

"দিদিকে লেখাপড়া করালে একটা চাকরিবাকরি করতে পারত, নিজে দেখেশুনে বিয়েও করতে পারত।"

"ঠাকুরপোই তো পড়তে দিল না। বাড়ি থেকে বেরনো পর্যন্ত বন্ধ করে দিল।" উমার গলায় ক্ষোভ উঠে এল। "যেমন কপাল করেছে তেমনই তো

হবে।”

কপাল ! রতনের মনে হল শব্দটা যেন সে এই প্রথম শুনল। মায়ের দিকে তাকিয়ে অবাক স্বরে সে বলল, “কপাল কেন !”

“কপাল নয়তো কী। কপালে যার যা থাকে তেমনই তার হয়। তোর কপালে যা আছে তাই হবে।”

“কী আছে আমার কপালে, মা ?”

উমা কয়েক লহমা ভেবে নিয়ে বলল, “জানি না।”

পাশের ঘর থেকে কাকার ডাক শোনা গেল, “রতু একবার শুনে যা।”

রতন ঘরে ঢুকে দেখল কাকা বিছানায় শোয়া। মাথার পিছনে দুই হাত, চোখ বন্ধ।

“দোকানটা বিক্রি করতে হবে, তুই রাজি ? এটা তোকে জিজ্ঞেস না করে করতে পারি না। মানুর বিয়েতে হাজার পাঁচেক টাকা তো লাগবেই।”

“আমি ভেবেছি দোকান রেখে আর দরকার নেই।”

“ভেবেছিস তাহলে, গুড।...তোর পড়াশুনো চলছে কেমন ? সেকেন্ড ডিভিশন হবে ?”

তার লেখাপড়ার বহর কতটা কাকা তা জানে বলেই ফার্স্ট ডিভিশানের আশা করেনি। রতন মুখ নামিয়ে বলল, “জানি না।” একটু আগে মা এইভাবেই বলেছিল ‘জানি না’।

“সেকেন্ড ডিভিশানটা হলে আমার অপিসেই চেষ্টা করে দেখতে পারি। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সংসার খরচও বাড়ছে, আমি একা আর কত চালাব।”

আর কত চালাব বলল কেন ! বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে নাকি ? রতনের মনে প্রথমে এই দুর্ভাবনাটাই চমকে উঠল, তারপর মনে হল চাকরিতে ঢুকলে কলেজে পড়া হবে না। অবশ্য নাইটে কলেজে পড়া যায়। কলেজে পড়ার স্বপ্ন সে অনেকদিন ধরে দেখছে। সামনের বাড়ির ছোটুদা একদিন যখন কলেজে যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরোয় তখন সেও স্কুলে যাবে বলে বেরিয়েছে। খান চারেক বই আর তিনটে খাতা বুকের কাছে ধরা। পরনে হাফ প্যান্ট, ফিতেওলা জুতো। ছোটুদা হাতের একখানা মাত্র খাতা আর একটা মোটা বই দোলাতে দোলাতে চটি পরে যাচ্ছিল। মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি। সে দ্রুত পায়ে ছোটুদার পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আজ এখন যাচ্ছেন যে ?’

‘আজ সাড়ে দশটায় ক্লাস।’

শুনে সে অবাক হয়ে গেল। আজই শুধু সাড়ে দশটায়, রোজ নয় ? ‘কখন ছুটি হয় কলেজ ?’

‘আজ চারটে পিরিয়ড...পৌনে দুটোয় ছুটি হবে আমার। মাঝে একটা পিরিয়ড অফ।’

রতন তখন অফ শব্দটার মানে জানে কিন্তু চার পিরিয়ড ক্লাস। এটাই প্রথম তার কল্পনায় টোকা দেয়।

'কোন ক্লাসে পড়ো ?'

'সেভেন।'

'তা হলে তো তিন বছর পরই কলেজে ঢুকবে।'

'আপনি শুধু একটা বই নিয়ে যাচ্ছেন যে ?'

ছোটুদা কী রকম একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেছিল, 'দরকার লাগে না। প্রফেসারের লেকচারের নোট নিলেই হয়।'

স্কুলের বাইরে আর একটা জগৎ আছে সেখানে ঢুকলে এইভাবে হাসা যায়। প্রফেসার, লেকচার, নোট এই সব শব্দ সেখানে ছড়িয়ে আছে, নব মিত্তির লেনের কটা লোকই বা তা জানে ! এখন ছোটুদা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আর মালকোঁচা করে না, গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে, কাঁধে থাকে রঙিন একটা কাপড়ের ঝোলা। রাস্তায় দেখা হলে হেসে চলে যায়। ছোটুদা সদর দরজার কড়া নাড়লে দিদি জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। না দাঁড়ালেও ছোটুদা আড়চোখে জানালার দিকে একবার তাকাবে। রতন এটা লক্ষ করেছে।

রতন প্রায় ফিসফিস করে বলল, "আমি কলেজে পড়ব।"

বিষ্ণু চোখ খুলে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করল। "আগে পাস কর। ...টেস্টে তো কোনওরকমে— ।"

রতন মুখ নিচু করে ফিরে আসে। উমা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে সে বলল, "দোকান বিক্রি করবে বলল।" উমার চোখে বিষণ্ণতা ছেয়ে এল, কিছু বলল না।

দিনে ছ-সাত ঘণ্টা বই খাতা নিয়ে রতন বসতে শুরু করল। সকালে স্যারের বাড়ি যাওয়া ছাড়া আর সে বাড়ি থেকে বেরোয় না। শিবিদের গলির কাছে পৌঁছে সে মন্থর হয়ে যায়। আড়চোখে গলির ভিতরে তাকায়। হতাশ হয়। ফেরার সময়ও একই ব্যাপার ঘটে। শিবিকে দেখতে, ওর সঙ্গে কথা বলতে তার খুবই ইচ্ছে করে। ইচ্ছেটা বাড়ে যতই সে হতাশ হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মুখে এসে যদি দাঁড়ায়, কত মেয়েই তো দাঁড়িয়ে পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে। শিবির কি পাড়ায় বন্ধু নেই ? তবে সকালবেলাটা গল্প করার সময় নয়। হয়তো ওর অসুখ এখনও সারেনি। গিয়ে একবার অসুখের খবর নিতেও যাওয়া যায়, কেউ কিছু মনে করবে না। তবে ওর মা বোধহয় পছন্দ করবে না। 'তুমি আর এখানে থেকো না'...আপনজনের মতো সুরে বলাটা হলেও তার কানে ঠেকেছিল 'এখানে তুমি আর এসো না।' হয়তো তার চেহারায় মলিনতা দেখে, বাড়ির অবস্থা বুঝে নিয়ে শিবির মা চায়নি এমন একটা ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের ভাব থাকুক। কিন্তু শিবিরাই বা কী এমন উঁচুদরের লোক ? রমলা লাহিড়ী কি তার মায়ের মতো তো নয়, ধারেকাছেও আসে না। 'আচ্ছা এবার আমাকে তো এখুনি

কলেজ যেতে হবে'... কি সুন্দর করে বলেছিল রমলার মা! শিক্ষিত বড় ঘর একেই বলে, এ সব শেখার জিনিস। ওদের সঙ্গে মিশলে কথাবার্তা আচারব্যবহার শেখা যায়। কিন্তু রমলাদের বাড়িতে যাওয়ার কোনও সুযোগ তার নেই। ওই একবারই যেতে পেরেছিল আর জীবনে সুযোগ আসবে না।

স্যারের বাড়ির গলি থেকে বেরিয়েই রতন দেখতে পেল শিবির মাকে। হেঁটে চলেছে গোলাপ দত্ত লেন ধরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে। দেখেই সে ধীরে হাঁটতে শুরু করল ব্যবধান বাড়াবার জন্য। ধবধবে সাদা কালোপাড় শাড়ি, বগলে একটা চামড়ার ব্যাগ, পাতলা সাদা কাপড়ের ব্লাউজ ব্রেসিয়ার বেশ স্পষ্ট, পাতলা চটি। হাঁটছে দ্রুত বোধহয় কোথাও যাবার তাড়া আছে। একবার শুধু মুখ নামিয়ে পানের পিক ফেলল রাস্তার ধারের আঁস্তাকুড়ে। রতন পিছন পিছন এল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে। শিবির মা রাস্তা পার হয়ে পেট্রলপাম্পের সামনের বাস স্টপে দাঁড়াল। রতন রাস্তা পার হল না।

শিবির মা নয় নম্বর স্টেট বাসে উঠে ধর্মতলার দিকে চলে যাবার পর রতন আবার গোলাপ দত্ত লেনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। নিশ্চয় বাড়িতে শিবি আছে, অসুখে শুয়ে থাকলে ওর মা বাড়ি ছেড়ে বেরোত না। বাসে চড়ে লোকে দূরেই যায় শিগগির তা হলে ফিরে আসছে না। দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে দেখল ঘরের জানলাটা খোলা। রতন জানলায় এসে গোড়ালি তুলে উঁকি দিল। ঘরে কেউ নেই। সে দরজার কড়া আস্তে আস্তে তিনবার নাড়ল।

"কে ?...দাঁড়াও।" ভিতর থেকে শিবির গলা শোনা গেল।

মিনিট দুই পর দরজার খিল খোলার শব্দ হল। রতন দরজার সামনে থেকে পাশে সরে দাঁড়াল। দরজার পাল্লা অল্প ফাঁক করে শিবির মুখ বেরিয়ে এল, ভেজা চুল লেপটে রয়েছে মাথায়, গালে।

"ওম্মা, তুমি!" বলেই হি হি করে শিবি হেসে উঠল। "নেড়ু!...ন্যাড়া হলে কেমন যেন দেখতে লাগে। চান কচ্ছি, ভেতরে এসো।" শিবি দরজা খুলে রেখে বাড়ির ভিতরে চলল। রতন দেখল শুধুমাত্র একটা ভিজে শপশপে গামছা শিবির শরীরে জড়ানো গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আব্রু রক্ষা করতে শরীরে আর কোনও বস্ত্র নেই। তার মাথার মধ্যে কৈশোর ও যৌবনের সংযোগ রাখা অদৃশ্য যোগাযোগটি ভস্ম হয়ে তার স্বার্থহীন নিষ্পাপ সারল্যকে বিচ্ছিন্ন করে দিল মুহূর্তে। সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখন শিবির কাছাকাছি হতে তার সঙ্কোচ হচ্ছে। তার স্বাভাবিক বোধ থেকে মনে হল ওর শরীরের দিকে তাকানো উচিত নয়। কিন্তু সে তাকাল।

"আরে এসো...দু' মিনিট, আমার হয়ে এসেছে।" শিবি ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। চোখ নামিয়ে রতন ভিতরে পা বাড়াল।

"দরজাটা বন্ধ করে দাও," শিবি চৌবাচ্চার দিকে এগোল। রতন ছোট্ট উঠোনের একধারে দাঁড়িয়ে দেখল শিবি দু' মগ জল মাথায় ঢালল। জলের

ধারা মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত নামছে। গামছাটা চামড়ার মতো পিঠের আর পাছার সঙ্গে সেঁটে। এভাবে সে মেয়েদের শরীর কখনও দেখেনি। বাড়িতে তার মা দিদি বা উপরের বউদি আর তার ননদ রয়েছে কিন্তু কেউই শরীরকে এমন অবহেলায় পুরুষদের চোখের সামনে খোলামেলা করে না।

"হয়ে গেছে। বাব্বাঃ জল যা ঠাণ্ডা।" শিবি তারে ঝোলানো শুকনো ফ্রক আর ইজের টেনে নামিয়ে ছুটে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। একটু পরে বেরিয়ে এসে ভিজে গামছাটা নিংড়ে মাথা ঘষতে ঘষতে বলল, "ছেরাদ্দ চুকে গেল ? কত লোক খাওয়ালে ?"

"দুশো।"

"দুউউশোওও !" শিবির চোখ কাচের মার্বেলের মতো গোল হয়ে উঠল। "এই পাশের বাড়ির বুড়ির ছেরাদ্দে খেয়েছিলুম একবার। বেশি লোককে খেতে বলেনি, বারো-চোদ্দজন হয়েছিল।... ন্যাড়া হয়ে তোমাকে কেমন যেন দ্যাখাচ্ছে, বোকাবোকা, ক্যাবলা-ক্যাবলা।" গামছাটা শিবি তারে মেলে দিল।

"দু' মাসের মধ্যেই আবার আগের মতো চুল হয়ে যাবে।" রতন বোকা-বোকা দেখাচ্ছে কথাটা পছন্দ করেনি। "মাথা কামালে চুল আরও ভাল হয়।"

"ছোটবেলায় মা বছরে দু'বার আমার মাথা কামিয়ে দিত। তাই তো আমার চুল এতো ঘন।"

"তোমার মাকে দেখছি না, বাড়িতে তুমি একা ?"

"মা তো ডিউটিতে গেল। নার্সিং করে...প্রাইভেট নার্সিং। আজ গেল ধর্মতলায় নার্সিংহোমে, একটা মাড়োয়ারি বউয়ের পেট থেকে পাথর বার করবে। মাকে ওরা রেখেছে তিন দিনের জন্য।"

"তিনদিন তোমার মা ওখানে থাকবে ?" রতন অবাক হয়ে বলল। "তিনদিন তুমি একা বাড়িতে থাকবে ?"

"ন্যাড়া হয়ে তুমি সত্যিই বোকা হয়ে গেছ। বাড়িতে এত বড় একটা মেয়েকে রেখে কোনও মা রাতে বাইরে থাকতে পারে ? তোমার মাথায় দেখছি গোবর রয়েছে, পরীক্ষায় তো ফেল করবে।" শিবির দাঁত হাসির সঙ্গে ঝকঝকিয়ে উঠল।

"মা শুধু মর্নিং ডিউটি নেয়, সকাল ছটা থেকে সন্ধে ছটা।"

"ফেল করব বললে। তোমার খারাপ কথা তো সত্যি হয়ে যায়।" রতন হাসল বটে। কিন্তু মনের কোণে একটা খোঁচা পাওয়ার ব্যথা জমে গেল।

"য়্যা...না, না, না, এটা সত্যি হবে না।" শিবির চোখমুখ বদলে গেল। রতন হালকা সুখ পেল ওর উদ্বিগ্ন মুখ দেখে। শিবি তার ভাল হোক চায়।

"আমি যা বলি মন থেকে কিন্তু বলি না, এমনিই বলি। আচ্ছা, এবার বলি তুমি পাস করবে। ঘরে এসো।" শিবি তার বাহুতে একটা হাল্কা চাপড় দিয়ে ঘরের দিকে এগোল, রতন পিছু নিল।

"তুমি স্কুলে যাও না ?"

"কর্পোরেশন স্কুলে পড়তুম, ছেড়ে দিয়েছি। পড়তে ভাল লাগে না।"

কর্পোরেশন স্কুল ক্লাস ফোর পর্যন্ত, ওখানে বস্তির গরিব ছেলেমেয়েরাই পড়ে। তাদের মতো ভদ্র শিক্ষিত বাড়ি নাক কোঁচকায় বিনি পয়সার স্কুলের নাম শুনলে। রতন ধরে নিল শিবি ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে। সে বলল, "তা হলে সারাদিন কী করো ?"

"কী আর করব, টো টো কোম্পানি ! বাড়ির সব কাজ, রাঁধা, বাসনমাজা, দোকানবাজার করা, ঘর মোছা, কাপড় কাচা...আমাদের তো তোমাদের মতো ঝি রাখার পয়সা নেই।"

রতনদের ঘরের কাজ করার লোক নেই। মা আর দিদিই সব করে। বাড়ির জঞ্জাল রাস্তায় ফেলত ছোটবেলায় দিদি, এখন মা। এ ধার ও ধার তাকিয়ে ঝপ করে দরজার পাশেই আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। রতন গলা ভারী করে বলল, "ঝি না এলে নিজেদেরই তো সব কাজ করতে হয়। তখন তো গরিব-বড়লোক বলে কোনও তফাত থাকে না।"

শিবি আর তারা যে একটা সময়ে একই স্তরের মানুষ হয়ে যায়, এটাই সে জানাতে চেয়েছে। তারা পয়সাওলা, শিবির এই ধারণাটা তাকে কাঁপিয়ে দিল। দুশো লোক খাওয়ানোর কথাটা শুনেই বোধহয় ধারণাটা হয়েছে। হঠাৎ মিথ্যা কথাটা কেন যে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ! একটু ভয়ও হল, যদি কখনও শিবি জানতে পারে তাদের ঘরের খবর ? সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পেরিয়ে কি ও তাদের পাড়ার দিকে যায় ? কিংবা কাকিমার কাছ থেকে যদি কোনওদিন শুনে ফেলে !

"আজ মা রান্না করে গেছে...দুটো ভাত খাবে ?"

"না না আমার খিদে নেই।" রতন খাতা ধরা হাতটা তুলে জোরে নাড়ল।

"কীসের খাতা, দেখি।" শিবি খাতাটা রতনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাতা ওল্টাল। "ওরে বাবা কী বড় বড় অঙ্ক...এগুলো তুমি করেছ ?...ইংরিজিতে করতে হয় !" শিবির স্বরে সমীহ এবং বিস্ময়। রতনের বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল।

"অ্যালজ্যাব্রা বলে ওগুলোকে, তুমি বুঝবে না।"

"পাস করে কী করবে ?"...দাঁড়িয়ে কেন, খাটে বসো না।"

রতন পা ঝুলিয়ে খাটে বসল। জানলা দিয়ে স্যারের বাড়ির জানলাটা দেখা যাচ্ছে। সে সরে বসল।

"ভাবছি জার্মানি যাব। ওখানে প্রচুর চাকরি আছে। আমার পাড়ার গৌর বলে একজন গেছে, ওর দাদা বলল হপ্তায় আড়াই হাজার টাকা মাইনে পায়।...হয়তো বাড়িয়ে বলল, তা হলেও দু' হাজার তো নিশ্চয় পায়। তাই বলে ভেবো না খুব বড়লোক, এখানে জিনিসপত্রের দামও খুব।"

"কিসে করে জার্মানি যাবে, উড়োজাহাজে ?" শিবি খাটে বসল রতনের গা

ঘেঁষে। ওর মাথা থেকে সে নারকোল তেলের গন্ধ পেল।

"হ্যাঁ, প্লেনে।"

"আমার খুব উড়োজাহাজে চাপতে ইচ্ছে করে।"

হঠাৎই, রতনের ভিতর থেকে কে যেন ঠেলে কথাটা তার মুখ দিয়ে বার করে দিল। "ওখানে যদি চাকরি পাই, তোমাকে প্লেনে করে নিয়ে যাব, যাবে ?" সে অধীর আগ্রহ নিয়ে শিবির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"ঠিক ?"

"ঠিক।"

শিবি এবার অদ্ভুত একটা ব্যাপার করে বসল। পাশে ঝুঁকে শব্দ করে রতনের গালে চুমু দিল। একটা হল্কা রতনের মাথার মধ্য দিয়ে বয়ে গেল।

"এমনি এমনি যাব না, বিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।" চোখ দুটো আধবোজা করে মাথা হেলিয়ে শিবি বলল। রতন বোকার মতো হাসতে শুরু করল।

"অ্যাই শিবি।" জানলার বাইরে থেকে মেয়ে গলার ডাক শোনা গেল।

"কে রে, মংলা ?" শিবি জানলার ধারে গেল।

"ভেলোদা বলল, চিত্রলেখায় দেবানন্দের বই এসেছে, যাবি তুই ?"

রতন দেখল শিবিরই বয়সী বা বছর দুয়েকের বড় একটি মেয়ে। রুগ্‌ণ ফ্যাকাসে রঙ, সামনের দাঁত দুটো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। পরনে মিলের রঙিন ডুরে শাড়ি।

"কবে ?"

"আজ আড়াইটের সো। যাস তো টিকিট কাটবে, আমিও যাচ্ছি। তুই না গেলে ভেলোদা যাবে না বলেছে।" মেয়েটি এক চোখ বন্ধ করে ঠোঁট টিপে হাসল।

"আ হা হা আমি না গেলে যাবে না !" আদুরে গলা শিবির। "তুই তো আছিস, ভেলোদার আর ভাবনা কী ?"

"মেলাদিক করিস না তো, যাবি কি না বল। ভেলোদা দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

"আর কে যাবে ?"

"সোনা আর বাবলু।"

"বই শেষ হলেই কিন্তু বাড়ি চলে আসব, কোথাও খেতে ঢুকব না।"

মংলা আর দাঁড়াল না। শিবি জানলা থেকে ফিরে খাটে বসল।

"কে ?"

"আমার বন্ধু, পাড়াতেই থাকে।"

অনেকগুলো কৌতূহল রতনের বুকের মধ্যে থেকে উঠে আসতে চাইছে কিন্তু সে চেপে রাখল। শিবি গায়ে পড়া হতে পারে তাই বলে সে কেন গায়ে পড়ে প্রশ্ন করবে ?

"তুমি এ পাড়ার ছেলেদের চেনো ?" শিবি জানতে চাইল। রতন জানাল,

কাউকেই চেনে না তবে যাতায়াত করার জন্য কিছু মুখ চেনে।

"ভেলোদাকে দেখেছ ?...রোগা, লম্বা, সাদা প্যান্ট আর সবুজ গেঞ্জি পরে থাকে। ওদের মিষ্টির দোকান আছে, খুব বড় দোকান বিডন স্ট্রিটে।"

"আমি এখন যাই।"

"যাবে, আচ্ছা এসো।"

সদর দরজার কাছে এসে শিবি বলল, "মন দিয়ে পড়বে কিন্তু।" রতন মাথা হেলালো। কী জন্যে যেন তার মন ভার হয়ে উঠেছে।

দুপুর দুটোর আগেই রতন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে চিত্রলেখা সিনেমা হলের বিপরীত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। সিনেমা হলের সামনে ভিড়। টিকিট ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে। ইভনিং শোয়ের জন্য টিকিট কাউন্টারে লাইন পড়েছে। রতন একটা গলির মুখে বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওই দিক থেকেই ওরা আসবে। অবশেষে সে ওদের দেখতে পেল। তার চোখ আটকে রইল শিবির উপর। মংলা নামের মেয়েটা আর দুটি ছেলে, রতনের থেকে বয়সে বড়, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে হাঁটছে। তাদের পিছনে শিবি আর বোধহয় সেই ভেলোদা। শিবির পরনে ছাপা সিল্কের শাড়ি। চুল টেনে গোলাপি রিবনে বাঁধা, গোলাপি ব্লাউজ। তার পাশে গা লাগিয়ে হাঁটছে লম্বা রোগা লোকটা। রতন চোখ তীক্ষ্ণ করল। বুকের মধ্যে তোলাপাড় হচ্ছে। শিবি সরে যাচ্ছে না, লোকটার স্পর্শ যেন পছন্দই করছে। একবার চোখ পাকিয়ে রাগের ভাব দেখাল, লোকটা দাঁত বার করে হাসল। কী কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে ? ওরা সিনেমা হলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। শিবির কপালের টিপ দেখতে পাচ্ছে রতন। কানে পুঁথির দুল। চোখে বোধহয় সুরমা দেওয়া। পাউডার মাখার জন্য মুখের রঙ একটু ফ্যাকাসে। শিবি সেজেছে, অবশ্যই ওই লোকটার মন ভোলানোর জন্য।

রতনের বুকের মধ্যে কী যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে বুকটা খালি হয়ে গেল। সে গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ে হাঁটতে শুরু করল। এ গলি সে গলি দিয়ে হেঁটে সে পৌঁছল হেদুয়ায়। রেলিং ধরে সে জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে তার মাথা শান্ত হয়ে এল। ভাবতে চেষ্টা করল, এত বিষণ্ণ, এত মন খারাপ সে হল কেন ? প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পেল না। শিবি তার কে, যে জন্য মনে জ্বালা ধরল! ওকে একটা লোকের সঙ্গে সাজগোজ করে সিনেমা যেতে দেখে ? সে উত্তর খুঁজে পেল না। যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না তাই নিয়ে মাথাব্যথা করার কোনও দরকার আছে কি ? রতন এই প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে বাড়ির দিকে রওনা হল। বুকের মধ্যের ভারটা যেন দ্বিগুণ মনে হচ্ছে এখন।

পাঁচ

আস্তে আস্তে জুতোর খট খট শব্দটা পাশে এসে থামল। রতনের ঘাড়ের চামড়া সিরসির করে উঠল। বাঁ হাতের মুঠোয় বই ছেঁড়া পাতাগুলো কাঁপছে। মুঠো আলগা হয়ে পাতাগুলো মেঝেয় পড়ল। রতন মুখ তোলেনি।

"ওগুলো তোলো।" নিচু স্বরে বললেন, পরীক্ষা ঘরের পাহারাদার, এই স্কুলেরই শিক্ষক। রতন পাশের ছেলেটির দিকে তাকাল। ছেলেটি তার দিকেই তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রাখল নিজের খাতায়। রতন মুখ তুলে তাকাবার চেষ্টা করল। শান্ত, অনুত্তেজিত চোখ পাহারাদারের, যেন ব্যথিতও।

"তোলো।"

রতন নিচু হয়ে ভূগোল বইয়ের ছেঁড়া চারটে পাতা তুলল। সেগুলো, প্রশ্নপত্র এবং খাতাটা হাতে নিয়ে পাহারাদার বললেন, "এসো আমার সঙ্গে।"

সারা ঘরের পরিক্ষার্থীদের চোখ তাকে অনুসরণ করছে শুধু এইটুকুই সে বুঝতে পারল। ঘর থেকে বারান্দা তারপর একতলায় নামার সিঁড়ি। খটখট শব্দটার পিছন পিছন রতন হেডমাস্টারের ঘরে ঢোকার আগে একবার ভেবেছিল পা জড়িয়ে ধরবে কি না। টেবিলে রাখা চশমাটা চোখে দিয়ে স্থূলকায় গোল মুখ হেডমাস্টার জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। ছেঁড়া পাতাগুলো আর প্রশ্নপত্র আর খাতা টেবিলে রেখে পাহারাদার শুধু বললেন, "টুকছিল"।

ভ্রূ তুলে হেডমাস্টার রতনের মুখের দিকে তাকালেন। ছেঁড়া পাতাগুলো তুলে নিয়ে খাতাটা খুলে মেলাতে লাগলেন। মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটল।

"টুকতে গেছলে?"

কণ্ঠস্বরে এবং বলার ভঙ্গিতে রতনের মনে হল লোকটি স্নেহপরায়ণ। তার সর্বনাশ করবে না।

"আমি টুকিনি স্যার।"

"এগুলো তাহলে এনেছ কেন, টোকার জন্যই তো?"

রতন চুপ করে রইল।

"বইয়ের পাতা এনে কোনও লাভ তো হয়নি। এতে যা রয়েছে তার ওপর তো প্রশ্ন আসেনি।" হেডমাস্টার চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা অপ্রিয় কর্তব্য থেকে রেহাই পাওয়ার হাসি হাসলেন। রতনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে গালে নামল। "মিছিমিছি বইটা নষ্ট করলে, সামনের বছর তো দরকার হবে।" ঝুঁকে খাতাটা তুলে পাতা উল্টে পড়তে লাগলেন রতনের লেখা **উত্তর**। পড়তে পড়তে ঠোঁট বেঁকে উঠল।

"যাও পরীক্ষা দাও।" পাহারাদার শিক্ষকটিকে বললেন। "নিয়ে যান... দিক পরীক্ষা।" প্রশ্নপত্র আর খাতাটা এগিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ নাক থেকে বার করে নিশ্চিত গলায় বললেন, "পাস করতে পারবে না।"

ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে রতন মাথা নিচু করে রইল। ঘরে অন্তত জনাকুড়ি ছেলে, অর্ধেকই অন্য স্কুলের, অচেনা। কোনওদিন দেখা হলে তাকে চিনতে পারবে। তার নিজের স্কুলের ছেলেরা বলাবলি করবে, টিচাররা জানতে পারবে। স্যার তো জানবেনই। পাড়ার লোকেরা যদি জানতে পারে! বাড়িতে খবরটা পৌঁছবেই। কাকা কী বলবে ? রতনের বুকের মধ্যে থরথর করে উঠল। তার মনে হচ্ছে গরম বাষ্প নাক দিয়ে ঢুকে চোখ দিয়ে বেরোতে চাইছে, সে কিছু আর দেখতে পাচ্ছে না।

তার বাঁ কব্জিতে কাকার ঘড়ি, পরীক্ষার জন্য পরতে দিয়েছে। জীবনে এই প্রথম তার ঘড়ি পরা। প্রশ্নের উত্তর লিখতে সময়ের হিসেব রাখার জন্য ঘড়ির দরকার, তাই কাকা নিজে থেকেই দিয়েছে। "কোয়েশ্চন পেপার পেয়ে প্রথমে মন দিয়ে সবগুলো পড়বি। যেগুলো সহজ মনে হবে আগে সেগুলোর উত্তর লিখবি।" রতন শূন্য দৃষ্টিতে খাতাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

পিঠে হাত পড়ল। পরীক্ষার পাহারদার ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, "বসে থেকো না... লেখো।"

রতন মাথা নাড়ল। সে আর লেখার কথা ভাবতে পারছে না।... 'পাস করতে পারবে না।'... না পারলে তার কী হবে! কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। 'আমি কলেজে পড়ব'... 'আগে পাস কর।' 'সেকেন্ড ডিভিশন হবে ?' কাকা শুনলে কী করবে ? স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করার জন্য একটা কঞ্চি দিয়ে পিটিয়েছিল। বাবা বলেছিল, 'মারুক, মারুক... মার খেলে মানুষ হবে।' দিদি ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে মারের শব্দ কেউ না শুনতে পায়। সে কিন্তু চেঁচায়নি, কাঁদেনি। রাতে দুলাল এসে বাবাকে বলেছিল, 'মারলে কি লেখাপড়ার মাথা তৈরি হয় ? আমার বাবা হপ্তায় একটা করে বেত ভাঙত আমার পিঠে, তাতে কিছু হয়েছে কি !'

"স্যার পাতা চাই।"

রতনের পিছনের ছেলেটির খাতা শেষ হয়ে গেছে, আরও লেখার জন্য তার কাগজের পাতা চাই। রতনের খাতায় এখনও ছ'টা সাদা পাতা রয়ে গেছে। কাগজের বাক্সে ভরা দোয়াত তার সামনে রাখা। লিখতে লিখতে কলমের কালি ফুরিয়ে গেলে দরকার হবে তাই সঙ্গে করে আনা। চার দিন পরীক্ষা হয়ে গেছে, একবারও কলমের কালি ফুরোয়নি। চারটে পেপারেই বোধহয় পাস করে যাবে, ভয় ছিল ভূগোল আর সংস্কৃতে। এখন সে সব ভয়ভাবনার উর্ধ্বে। একটা হাসি রতনের মুখটাকে বিকৃত করে দিল। মুখটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠার আগেই সে স্থির করে ফেলল, যা হবার হোক সে বাকি বিষয়গুলোর পরীক্ষা দেবে।

খাতা জমা দিয়ে সবার আগে সে পরীক্ষার ঘর থেকে বেরোল। স্কুলের যে ক'জন তার সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মুখোমুখি সে হতে চায় না। বাড়িতে স্বাভাবিকই রইল তার কথাবার্তা আচরণ। সে জানে ঘটনাটা বাড়িতে

জানাজানি হবেই। তবু যে ক'দিন সবার দিকে মুখ তুলে কথা বলার ভরসাটুকু পাওয়া যায়।

ভরসাটুকু দিন সাতেক পরই শেষ হয়ে গেল। অনাথ ঘোষ সকালে রতনদের বাড়ি এসে টুকতে গিয়ে ধরা পড়ার কথাটা জানিয়ে দিল। বাড়ির ভিতর ঢোকেনি, সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই বিষ্ণুর সঙ্গে মিনিট তিন কথা বলে চলে যায় ব্যস্ত হয়ে। বাড়িতে ছাত্ররা তার অপেক্ষায় রয়েছে।

রতন ঘরে বসে রয়েছে। সে আন্দাজ করতে পারছে না কাকার প্রতিক্রিয়া কী ধরনের হবে। স্যার চলে যাবার পর কাকা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সাড়াশব্দ নেই। এখন অফিস যাবার জন্য চান করার কথা, তারপর খেতে বসা। রতন টের পাচ্ছে কাকা চান করতে গেল। "ভাত দাও" বলল। খেয়ে উঠে অফিস গেল, একবারের জন্যও এ ঘরে এল না, তাকে ডাকলও না। রতনের বুকের মধ্যে জমতে শুরু করল কংক্রিটের চাঙড়। দিদি আর মাকে স্বাভাবিক দেখে সে বুঝল কাকা কাউকে কিছু বলেনি। তার বুকের ভারের সঙ্গে যুক্ত হল আতঙ্ক। কাকা কী করতে চায় ?

সেটা জানতে পারল দিন দশেক পর, সন্ধ্যায় কাকা যখন ডেকে পাঠাল।

"অক্ষয় বর্ধনের নাম শুনেছিস, দাদার বন্ধু ছিল ?" বিষ্ণু খাটে ঠেস দেওয়া উঁচু বালিশে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে শুয়ে শান্ত ধীর গলায় বলল। রতন মাথা নেড়ে জানাল নামটা শোনেনি।

"তোর বাবার সঙ্গে গঙ্গায় সাঁতার কাটত, একসঙ্গে গাঁজা ভাং খেত, বিদ্যা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত। সেই অক্ষয় এখন বৈঠকখানায় বিরাট প্রেসের মালিক। বাপের ছোট প্রেস ছিল সেটাকেই বড় করেছে খেটেখুটে নিজের চেষ্টায়। লক্ষ লক্ষ টাকার কাজকম্মো করে। অক্ষয়ের কাছে গেছলুম, তোকে একটা কিছু কাজটাজ যদি দেয়। যদি বন্ধুর কথা মনে রেখে তার ছেলের জন্য কিছু করে। প্রেসে তো লোকজন লাগেই। লোকটা ভাল, বলল পাঠিয়ে দিতে।" একটানা কথা বলে বিষ্ণু দশ সেকেন্ডের মতো নীরবতা ঘরে ছড়িয়ে দিল।

"কাল সকালে যাবি।... বর্ধন প্রেস, বৈঠকখানায় যাকে জিজ্ঞেস করবি দেখিয়ে দেবে, বৈঠকখানা চিনিস ?"

"শেয়ালদায়।"

"হ্যাঁ। কাল ঠিক দশটায় যাবি, হেঁটে। গাড়িভাড়ার পয়সা আমি দেব না।... গিয়ে বলবি আমি গুপিনাথ রায়ের ছেলে।... হাফ প্যান্ট পরে যাবি না। বাবার যে ধুতি রয়েছে তাই পরে যাবি। আর... যে কাজ দেবে, ঘর ঝাড় দেবার কাজ হলেও নিবি।... যাহ্।"

ছোট্ট 'যাহ্' শব্দটা রতনকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিল আর সেই সঙ্গে তার কলেজে পড়ার স্বপ্নটা চুরমার হয়ে গেল। কাকার কঠিন শান্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা গলা তাকে জানিয়ে দিল এবার তার জীবন কোন পথে যাবে। কাকার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো কোনও সামর্থ্য, সাহস বা ক্ষমতা তার

নেই। এই সংসার এখন এই একটা লোকেরই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভর দিয়ে চলছে। নির্মমভাবে ব্যর্থতার বোঝা কাকা তার কাঁধে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছে ঠাণ্ডা মাথায়। প্রতিবাদ করে সে বিপদ ডেকে আনতে চাইল না।

পরের দিন রতন প্রায় আধঘণ্টা হেঁটে দুজন লোককে জিজ্ঞাসা করে বৈঠকখানায় অক্ষয় বর্ধনের প্রেসে পৌঁছল। একতলায় উঠোনের মতো বড় একটা জায়গায় বড় বড় মেসিন। মাথায় অ্যাসবেসটসের ছাউনি। তেল, মোবিলের সঙ্গে লোহা ঘষার গন্ধে একতলা ম ম করছে। রতন কালিমাখা জামা পরা একজনকে জিজ্ঞাসা করে দোতলায় উঠল। ধুতিটা সে ছোটুদার মতো মালকোঁচা করে পরেছে। আলমারি থেকে মা বার করে দিয়েছে, এটা পরেই বাবা নিমন্ত্রণ বাড়িতে কি বিজয়ার দিন আত্মীয় বাড়িতে যেত। ধাক্কা দেওয়া চওড়া পাড়, ন্যাপথালিনের গন্ধ লেগে রয়েছে। ধুতিটা উঠে গেছে, টেনেটুনে নামিয়ে সে সিঁড়ির পাশের দরজা দিয়ে ঢুকল।

ঘরটা আকারে তাদের শোবার ঘরের মতোই। রতন দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। লোহার রড বসানো পুরনো জানালা। মেঝেয় ধুলো। চওড়া দেয়ালে বহুকালের একটা ঘড়ি, ঝাঁপি কোলে নিয়ে পদ্মফুলের উপর বসে থাকা লক্ষ্মীর রঙিন ছবিওলা ক্যালেন্ডার, লক্ষ্মীর পায়ের পাশে প্যাঁচা। দরজার উপরে ব্র্যাকেটে বসানো চন্দনের ছিটে লাগা গণেশ, গলায় টাটকা একটা গাঁদার মালা। মুখোমুখি দুটি টেবলের একটা খালি। শার্ট পরা, টেরিকাটা একটি লোক মোটা খাতা খুলে পেন্সিল দিয়ে টিক দিচ্ছে আর বিড়বিড় করছে। বাঁদিকে একটা বড় টেবিল। সেখানে বসা স্থূলকায় লোকটি সাদা পাঞ্জাবি পরা, মাথায় টাক, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ফরসা, ডান গালে আঁচিল। কাকার দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল।

অক্ষয় টেলিফোনে কথা বলছে। এক পলক রতনের মুখের দিকে তাকাল। রতন ঢোঁক গিলল।

"আজ বিকেলেই প্রুফ পেয়ে যাবেন। প্রিন্ট অর্ডার পেলেই... না না, কথা দিচ্ছি প্রুফ এবার ঠিকই পাঠাব, আর ওই সঙ্গে নতুন কপিও হাতে দিয়ে দেবেন। কী করব বলুন, নতুন লাইনো মেসিন, কম্পোজিটারও নতুন। এখনও ঠিক সড়গড় হয়নি। আজই দু ফর্মা প্রুফ পাঠিয়ে দিচ্ছি।" ফোন রেখে অক্ষয় ব্যস্ত হয়ে বলল, "রবিবাবু দেখুন তো অমিয় এসেছে কি না। এলে উদয়াচলের কপিগুলো ওকে ধরিয়ে দিন।" কথা শেষ করে অক্ষয় জিজ্ঞাসু চোখে রতনের দিকে তাকাল। টেরিকাটা লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আপনার কাছে এসেছি। আমার কাকা বিষ্ণুচরণ রায় পাঠিয়ে দিলেন।" কোনওক্রমে কথাগুলো রতন দ্রুত বলে ফেলল।

"কে বিষ্ণুচরণ রায় ?" অক্ষয় মনে করার চেষ্টা করছে।

"আমার বাবা গোপীনাথ রায়।"

"ও ও ও, গুপির ছেলে... তাই বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার কাকা তো এসেছিল। গুপিকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখতুম। বড় ভাল ছিল।"

উমা বলে দিয়েছিল রতন টেবিল ঘুরে গিয়ে নিচু হয়ে অক্ষয়ের পায়ের দিকে হাত বাড়াল। পাম্প শু-র গোড়ালির একটা ধার ক্ষয়ে বেঁকে রয়েছে, চামড়ায় ফাটা দাগ, মাসকয়েক কালি লাগানো হয়নি। জুতোর উপর হাত বুলিয়ে রতন মাথায় ঠেকাল।

"থাক থাক... তুমি এখন করছ কী ?"

"ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি, বসে আছি।" রতনের মনে হল আর কিছু বোধহয় বলার দরকার হবে না। কাকা সবই বলে রেখেছে।

"হুঁউউ... শুনলুম তো তোমাদের অবস্থা। গুপিটা উড়নচণ্ডে ছিল বটে তবে দিলও ছিল। অভাবে পড়ে কেউ হাত পাতলে ধার করেও তাকে দিত। তোমার কাকাও মনে হল লোকটি ভাল। নিজের বউ ছেলেমেয়ে সংসার সত্ত্বেও দাদার সংসারটাও চালাচ্ছে। এ রকম বড় একটা দেখা যায় না।" অক্ষয়ের কণ্ঠে প্রশংসা উঠে এল।

রতন আকাশ থেকে পড়ার ধাক্কাটা মুখ থেকে কোনওক্রমে সামলালো। কাকা বলেছে কি ! বউ ছেলেমেয়ে সংসার আছে ! করুণা জাগাবার জন্য আর কী কী মিথ্যা বলেছে কে জানে ! কাকার উচিত ছিল তাকে সব বলে তৈরি করে দেওয়া।

"কিন্তু তোমাকে এখানে কী কাজ দোব।" অক্ষয় চিন্তায় পড়ল এবং রতনের উৎকণ্ঠা বাড়ল। "আচ্ছা বসো, রবিবাবু আসুক।"

টেবলের সামনে দুটো চেয়ার। চেয়ার গণ্যমান্যদের জন্য, অফিসে আসা বাইরের বড় বড় কাজের লোকেদের বা অফিসের পদস্থদের জন্য। রতন জানে সে ভিক্ষার্থীর মতো এসেছে। মালিকের সামনে বসাটা উচিত হবে কিনা ঠিক করতে পারল না। রবির টেবিলের পাশে একটা টুল রয়েছে দেখে সেটায় গিয়ে বসল আর তখনই রবি ফিরে এল। হাতে একটা পাণ্ডুলিপি।

"এই দেখুন, অমিয় বলছে হাতের লেখা পড়া যাচ্ছে না। কম্পোজ করতে সময় লাগবে।" রবি কাগজগুলো অক্ষয়ের টেবিলে রাখল।

"তাই তো ! এ তো দেখছি পড়া মুশকিল। লেখাপড়া জানা লোকেদের হাতের লেখা এত খারাপ হয় কী করে !" অক্ষয় কাগজগুলো থেকে মুখ তুলে রতনের দিকেই তাকালেন, উত্তরটা যেন ওর কাছেই চান। রতন দূর থেকে তাকিয়ে হাতের লেখার কিছুই বুঝল না।

"অমিয়কে বলুন না একটু চেষ্টা করতে। অত বড় একটা ম্যাগাজিন যোগেশবাবুর মতো নামী সম্পাদক, ওর কাছে তো আমার কথার একটা দাম আছে। বলেছি বিকেলেই প্রুফ পেয়ে যাবেন... বলুন না। আচ্ছা আপনি অমিয়কে ডেকে আনুন, আমি ওকে বলছি।"

রবি বেরিয়ে গেল। অক্ষয় বিব্রত চিন্তিত স্বরে বলল, "কি কাণ্ড দ্যাখো

তো। একটা সামান্য ব্যাপার অথচ কাজটা আটকে রইল... হাতের লেখা পড়তে পারছি না। আরে কম্পোজিটরের কাজ করতে হলে সব রকমের হাতের লেখার সঙ্গে রপ্ত থাকতে হবে। ডেঁয়ো পিঁপড়েকে কালিতে চুবিয়ে সাদা কাগজে ছেড়ে দিলেও ভাল কম্পোজিটর সেই আঁচড় থেকে রবিঠাকুরের পদ্য বার করে নেবে... আরে এ আর এমনকী নোংরা কপি।" অক্ষয় পাণ্ডুলিপিটা তুলে টেবিলে আছড়ে রেখে দিল।

রতন নিছকই কৌতূহলের বশে বলে ফেলল, "আমি একটু দেখব ?"

"দ্যাখো।"

উঠে গিয়ে রতন প্যাডের কাগজে লেখা গোটা দশেক পাতার পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিল। অক্ষরগুলো অতি খুদে তাও জড়িয়ে লেখা। প্রচুর কাটাকুটি। মার্জিনে লাইন টেনে বসানো হয়েছে একটার উপরে আর একটা নতুন বাক্য। দুই লাইনের মাঝে নতুন কথা বসানো, যা প্রায় পড়া যায় না। নোংরা করে লেখা হলেও রতন পড়তে পারছে। 'পূর্বাচল' লিখতে গিয়ে সে এমন পাণ্ডুলিপি পেয়েছে।

"এই যে অমিয়, কী ব্যাপার !"

অক্ষয়ের গলা শুনে রতন চোখ তুলল। প্যান্টের মধ্যে গোঁজা শার্ট, ব্যাকব্রাশ করা চুল, স্বাস্থ্যবান, বছর পঁয়ত্রিশের একটি লোককে সে দেখল। দুনিয়াকে পরোয়া না করার চাহনি লোকটার চোখে।

"স্যার, ওই হাতের লেখা কম্পোজ করতে রাত দশটা বেজে যাবে, তার আগে পারব না। আর নয়তো ফ্রেশ নতুন করে লিখে দিন।"

"নতুন করে কাকে দিয়ে এখন আমি লেখাব !" অক্ষয়ের মুখে আতান্তরে পড়ার ছাপ ! "রবিবাবু পারবেন ?"

রবির মুখ অসহায় দেখাল। "আমি... আমি—।"

"আমি পারব।"

ছোট্ট দুটো শব্দ মুখ থেকে বার করে রতন তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য রাস্তা তৈরি করে নিল তখনই। সে যখন খালি টেবিলটায় কপি করতে বসল তখন তিনটি লোক তার পিছনে দাঁড়িয়ে। প্রথম প্যারা শেষ হতেই অক্ষয় বলল, "বাঃ, সুন্দর হাতের লেখা।" শুনে সিরসির করে উঠল পিঠ। একই কথা সে শুনেছে তারাশঙ্করের মুখ থেকে।

"কি অমিয়, পড়তে পারবে তো এবার ?" রবি বলল, চিমটি কেটে। কথাটা অমিয় কানে না তুলে বলল, "যেমন যেমন লেখা হবে কপি পাঠিয়ে দেবেন।" বলেই সে ঘর ছাড়ল। রতন দ্রুত কপি করে যাচ্ছে। পাশের ঘর থেকে একজনকে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। একটা পাতা শেষ হলেই সে প্রেসে অমিয়র কাছে সেটা পৌঁছে দিয়ে আসছে। দুপুর একটায় রতন শেষ করল। ততক্ষণ অনেক লোক ঘরে এসে অক্ষয়ের সঙ্গে কাজের কথা বলে গেছে, রতন মাথা তোলেনি।

"কত স্লিপ হল ?" অক্ষয় জানতে চাইল।

"সাড়ে বারো পাতা।"

"তোমার তো ভাত খাওয়া হয়নি মনে হচ্ছে।"

"আমি ভাত খেয়েই বেরিয়েছি।" রতন নাকেমুখে গুঁজে কোনওক্রমে খেয়েছে। এখন তার খুবই খিদে পাচ্ছে।

অক্ষয় এক টাকার নোট রতনের সামনে টেবিলে রেখে বলল, "পাশেই হোটেল আছে খেয়ে এসো। গুপির ছেলে তুমি, আমার কাছে কোনও লজ্জা করবে না। আজ তোমাকে দিয়ে আর একটা কাজ করাব। প্রুফ নিয়ে উদয়াচলের আপিসে যাবে, সেখানে অপেক্ষা করবে, কারেকশন করা প্রুফ নিয়ে এসে নীচে মদন বেরা নামে যে ইনচার্জ আছে তাকে দেবে। আর আমার সঙ্গে দেখা না করে বাড়ি যাবে না।"

মাথা নেড়ে রতন টাকাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থেমে পড়ল। "একটা ভুল ছিল আমি কপিতে ঠিক করে দিয়েছি।"

"ভুল ছিল ! কী ভুল ?" অক্ষয় বলল।

"লেখা ছিল 'কৃচ্ছ্রতা সহকারে ব্রত পালন', কিন্তু কৃচ্ছ্রর পর 'তা' হয় না ; আমাদের ব্যাকরণ পড়ান হরসুন্দরবাবু বলেছেন। তাই আমি 'তা'-টা তাই বাদ দিয়েছি।"

"করেছ কী !" অক্ষয় প্রায় আঁতকে উঠল। "যোগেনবাবু এম এ পাস, নামকরা লোক, ওঁর লেখায় কলম ছোঁয়ালে আর দেখতে হবে না। উনি যা লিখবেন সেটা বিদ্যাসাগর মশাইও মেনে নেবেন,...যাও যাও শিগ্গির 'তা' বসিয়ে দিয়ে এসো কপিতে।"

রতন ফ্যালফ্যাল করে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে দৌড়ে নীচে নেমে গেল। ইতিমধ্যে অমিয় 'কৃচ্ছ্র' কম্পোজ করে ফেলেছে। রতনের সমস্যার কথা শুনে টেরিয়ে তাকিয়ে বলল, "কদ্দিন এসেছ ?"

"আজই।"

"অ।" লাইনের কী বোর্ডে আঙুল টিপতে টিপতে অমিয় বলল, "অনেক পণ্ডিতের পণ্ডিতি তো দেখেছি। সব ধরা পড়ে এখানে। কেউ ইস্কুলে ভাল করে ব্যাকরণটাও পড়েনি আর বি এ, এম এ পাস করে বসে আছে। কী করে যে করে ! তুমি এসব নিয়ে বেশি ভেবো না, তোমার কারেকশন নিয়ে ট্যাঁ ফোঁ করবে তো নাই বরং তা খাইয়ে দেবে।"

"আমি বরং কপিতে 'তা'-টা বসিয়ে দিই।"

অক্ষয় দুপুরে বাড়ি গিয়ে ভাত খেয়ে, ঘুমিয়ে আবার বিকেলে আসে। তার আসার আগেই রবি উদয়াচলের ঠিকানা দিয়ে, রতনকে পাঠিয়ে দিল। বেশি দূরে নয়, বৌবাজারে একটা বাড়ির দোতলায় উদয়াচলের দফতর। হেঁটে পনেরো মিনিটের পথ ; সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কেও লেখা থাকে এই মাসিক পত্রিকায়।

একটা লম্বা ঘরে দুটো টেবিল, একটা বেঞ্চ আর ছড়ানো চেয়ারে পাঁচ-ছ'জন লোক বসে কথা বলছে। সকলেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। একজনের কাঁধে পাট করা চাদর। সবাই বয়স্ক, গম্ভীরদর্শন। দেখে রতনের সমীহ জাগল। মৃদুস্বরে সে বলল, "প্রুফ এনেছি।"

কোণের টেবিলে বসা লোকটি শুধু হাত বাড়াল। রতন তার হাতে কপি সমেত প্রুফ তুলে দিল। কপি খুলেই ভ্রু কোঁচকাল। কয়েক লাইন পড়ে রতনকে বলল, "কে কপি করেছে ?"

"আমি।" রতন ভয় পেল গম্ভীর গলা শুনে। এই লোকটিই বোধহয় যোগেনবাবু!

"বসো।" লোকটি বেঞ্চের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রুফ সংশোধন শুরু করল। একটু পরে মুখ তুলে বলল, "প্রুফে দেখছি কৃচ্ছ্র আর কপিতে তার সঙ্গে একটা 'তা' জুড়ে দেওয়া, ব্যাপার কী ?"

রতনের কপাল ঘেমে উঠল। গলা শুকিয়ে আসছে। প্রথম দিনেই সে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বসেছে। কী দরকার ছিল পাকামো করার। মাছি মারা কেরানির মতো কপি করলে এই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত না।

"লেখায় কৃচ্ছ্রতা ছিল কপি করার সময় মনে হল 'তা'-টা ভুল তাই বাদ দিয়েছিলুম। পরে মালিক বললেন, লেখায় যেমন যেমন আছে তেমনি কপি করতে। ততক্ষণে কম্পোজ হয়ে গেছে তাই কপিতে 'তা' জুড়ে দিয়েছি।" রতন ক্ষমাপ্রার্থীর মতো তাকিয়ে রইল।

"ও ভূপেশবাবু, কৃচ্ছ্র না কৃচ্ছ্রতা কোনটা কারেক্ট ?"

"কৃচ্ছ্রতা ভুল। বেশির ভাগ লোকই এই ভুলটা করে।" কাঁধে পাট করা চাদর রাখা লোকটি বলল। "জিজ্ঞেস করলেন যে, ভুল করেছেন নাকি ?"

"লেখাটা আমার নয়।"

সংশোধিত প্রুফ নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় রতন ফিরে এল বর্ধনপ্রেসে। অক্ষয় যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। "যোগেনবাবু একটু আগে ফোন করেছিলেন। তোর খুব প্রশংসা করলেন। আমি বললুম, আমার বন্ধুর ছেলে, এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। বাবা মারা গিয়ে খুবই দুরবস্থায় পড়ে আমার কাছে এসেছে। শুনে বললেন, চাকরি না করে ওর কলেজে পড়া উচিত।"

রতনের 'তোর' শব্দটা ভাল লাগল। সকালে 'তুমি' বলেছে অক্ষয়। বোধ হয় যোগেনবাবুর প্রশংসা খুশি করেছে। রতনের মনে হচ্ছে এখানে তার চাকরি হবে। 'তুই' করে বলাটা সেই রকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

"শোন, কাল থেকে কাজে আয়। তোকে মেশিনে লাগাব না। বাইরে এখানে ওখানে যাওয়ার, বিলের তাগিদ দেওয়ার, আদায় করার, ছোটখাটো অনেক রকমের কাজ আছে। প্রুফ দেখাটাও শিখে নিস।"

রতন উৎসুক হয়ে পড়ল আসল কথাটা জানার জন্য, কত মাইনে দেবে ? সঙ্কোচবশত জিজ্ঞাসা করতে তার বাধল।

"তোর ঘাড়ে তো এখন অনেক দায়। মায়ের যা রোগ তাতে চিকিচ্ছেতে অনেক টাকা লাগবে। ক্ষয় রোগ বড় মারাত্মক, ক্যাম্বেলে আমার এক চেনা চেস্ট স্পেশালিস্ট আছে ডাক্তার মাইতি, চিঠি লিখে দোব, মাকে দেখিয়ে আনিস।" অক্ষয় বলে যাচ্ছে আর রতন হতভম্ব হয়ে শুনছে। নিশ্চয় কাকার চালাকি। মায়ের রোগ হয়েছে বলে সহানুভূতি আদায়ের ফিকির। আরও কী কী বলেছে কে জানে!

"দুখ্যু হল শুনে তোর দিদির কথা। মায়ের দয়ায় মুখটা তো গেছে একটা চোখও গেল! য়্যা, বিয়ে হবে কী করে? ওকে তো সারা জীবন তোকেই দেখতে হবে।"

দিদিকে ওপরের অন্ন পিসি ভাবতে রতনের কষ্ট হল। রাগও হল কাকার উপর। তার দিদি মায়ের মতোই সুন্দরী আর তাকে কিনা কুচ্ছিত বানিয়ে দিল একটা কাজ পাওয়ার আশায়।

"এখন আশি টাকা দোব। তোর কাজকম্মো দেখি আগে, পরে বাড়াব। এত টাকা এই বাজারে কেউ দেবে না, খোঁজ নিয়ে দেখিস।...খুশি তো?"

রতন অভিভূত। সে চট করে অক্ষয়কে প্রণাম করে বলল, "হ্যাঁ জ্যাঠামশাই।"

'জ্যাঠামশাই' সম্বোধনে অক্ষয়ের মুখে আপত্তি ফুটল না। বন্ধুর ছেলে, ভদ্র, শান্ত বুদ্ধিমানও এবং মুখটি আকর্ষণীয় রকমের মিষ্টি। পণ্ডিত লোকের ভুল ধরেছে! তার মনে হয়েছে ছেলেটা সৎ। এমন ছেলেই তার দরকার, প্রেসে বড্ড চুরিচামারি হয়। সংসারের বোঝাটা বড় অল্প বয়সে ঘাড়ে নিতে হল বলে অক্ষয় কিছুক্ষণের জন্য বিষণ্ণ বোধ করে রতনের জন্য।

বারো আনা খরচ হয়েছে মাছ-ভাত খেতে পকেটে চার আনা রয়েছে। রতন হেঁটে না ফিরে বাসে উঠল শেয়ালদা থেকে। এক আনার টিকিট কেটে নামল হরিশা-র বাজারের সামনে। সেখান থেকে গ্রে-স্ট্রিট ধরে দশ-বারো মিনিট হাঁটলেই বাড়ি। সে ঠিক করল রোজ হেঁটেই যাতায়াত করবে। এক-দু মাইল হাঁটা কিছুই নয় তার কাছে। তাতে রোজ দু আনা বাঁচবে। মাসে তিন টাকার উপর। তাতে একজোড়া চটি কেনা যাবে। কাকার কাছে চাওয়া এবার বন্ধ হবে। এই বন্ধ হওয়ার কথাটা মনে আসতেই রতনের শরীর থেকে শ্রান্তির ভাবটা উবে যেতে শুরু করল। হাল্কা লাগল নিজেকে। কীসের যেন অদৃশ্য একটা বাঁধনে সে বাঁধা ছিল, সেটা এবার খুলে যাবে। আশি টাকা অবশ্যই তার নিজের জন্য খরচ করা হবে না, টাকাটা কাকার হাতেই তুলে দিতে হবে। অক্ষয় বর্ধনকে মিথ্যে কথা বলে ওর মন ভিজিয়ে দিয়েছিল বলেই হয়তো চাকরিটা সে পেল। কাকার এইসব বুদ্ধি খুব মাথায় খেলে— নিজে বিয়ে করেছে আলাদা সংসার আছে, মায়ের ক্ষয় রোগ, দিদির কুচ্ছিত মুখ বিয়ে হবে না। রতনের এখন আর রাগ হল না, বরং মজাই পেল। জ্যাঠামশাই যদি এইসব মিথ্যে কথা ধরে ফেলে? সে এতক্ষণ যে স্বাধীনতার আস্বাদ পাচ্ছিল

তার খানিকটা তেতো হয়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে সে উমা টি স্টোর্সের সামনে পৌঁছল। দোকানে তালা ঝুলছে। এই সময়ে দোকানে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকত বাবা কিংবা টাইপরাইটারে খুটখাট করত। খদ্দের খোঁজা হচ্ছে। যে কিনবে সে কি চায়ের দোকানই রাখবে? রতন কয়েক পা হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। রমলা লাহিড়িদের বারান্দার দিকে তাকাল। ঘরের আলো বারান্দায় পড়েছে টবে চন্দ্রমল্লিকা দেখেছিল, এখন নেই। রমলার মা বলেছিল, 'ভাল করে প্রিপারেশন করছ তো?' সে কি কোনও জবাব দিয়েছিল! বোধহয় না। রমলারা কি জানতে পারবে ভূগোল পরীক্ষায় সে টুকতে গিয়ে ধরা পড়েছে, সে খারাপ ছেলে, পরীক্ষায় ফেল করবে! তার সঙ্গে কোনওদিন যদি রমলার বা তার মায়ের দেখা হয়ে যায়! ওরা কি তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কেমন রেজাল্ট হল? ...যোগেশবাবু বলেছে, 'ওর কলেজে পড়া উচিত।' একটা কষ্টের হাসি রতনের মুখে ফুটে উঠল। রমলাদের দেখতে পেলেই লুকিয়ে পড়ব যেভাবে পাড়ার লোকেদের দেখলে লুকোই। তবে লোকে বেশিদিন কোনও ব্যাপারই মনে করে রাখে না। তরুণ পাঠাগারের সেক্রেটারিকে বলে দিতে হবে, আর সে লাইব্রেরিতে যেতে পারবে না।

নব মিত্র লেনের মোড়ে ডাক্তার বাড়ির রকে কয়েকটা লোক বসে। দূর থেকে তাদের দেখে রতন সিঁটিয়ে গেল। পাড়ার বয়স্ক লোক, ওদের সামনে দিয়েই তাকে যেতে হবে। ওরা নিশ্চয় জানে, বাড়ির কারুর কাছ থেকে নিশ্চয় শুনেছে। মুখটা কঠিন করে, পরোয়া করি না ভাব মুখে ফুটিয়ে সে লোকগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। তার দিকে কেউ তাকাল না দেখে স্বস্তি বোধ করল।

যা আশা করেছিল, ছুটে এল উমা আর মানসী। ওদের চোখে যে প্রশ্নটা রয়েছে রতন তা পড়ে নিয়ে জবাব দিল হাসি দিয়ে।

"হয়ে গেছে।"

"চাকরি হয়েছে!" উমা এমন ভাব করল, যেন না হবারই কথা ছিল।

"জ্যাঠামশাই কাল থেকে যেতে বলেছে।"

উমা দু হাত কপালে ঠেকাল। "কাকা ওঘরে রয়েছে, গিয়ে বল।"

"কী কাজ করতে হবে রে রতু?" মানসীর প্রশ্ন।

"অনেক রকমের কাজ। অফিসে বসে আবার বাইরে ঘুরেও।" রতন জামা খোলায় ব্যস্ত থেকে বলল। সারা দিনের কাজের ফিরিস্তি দেবার ইচ্ছা তার নেই, শরীর বেশ ক্লান্ত।

"তোকে কী জিজ্ঞেস করল?...ওনার কথা বলল?"

"বলল। বাবার খুব প্রশংসা করল। বাবার কাছে কেউ হাত পাতলে ধার করেও নাকি তাকে টাকা দিত।" আড়চোখে রতন দেখল মা'র মুখ ঝলমল করে উঠল।

"খুব বড় আপিস ?" মানসীর প্রশ্ন।

"খুব বড় নয়। তবে প্রেসটা বড়। অফিসে জ্যাঠামশাই আর রবিবাবু নামে একটা লোক। আর একটা লোকও কাজ করে, সে আজ আসেনি অসুখ হয়েছে।"

"খেয়েছিস কিছু ?"

"একটা টাকা দিয়েছিল, ভাত খেয়েছি।"

"কী কাজ করলি ?" মানসীর প্রশ্ন।

"একটা লেখা কপি করলুম। সেটার প্রুফ নিয়ে উদয়াচল বলে একটা পত্রিকার অফিসে গেলুম। প্রুফটা কারেকশন করে দিল, সেটা নিয়ে আবার ফিরে এলুম।" ধুতি খুলে রতন আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় খাটে বসল। তার ইচ্ছে করল কাকা তাদের সম্পর্কে যা বলে এসেছে সেগুলো বলতে। কিন্তু বলল না। শুনলে মজা নাও পেতে পারে। তাছাড়া কাকা চটে যেতে পারে। এখনও বহুদিন তাদের কাকার দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে।

"কাকার সঙ্গে দেখা করে আয়।...হ্যাঁ রে কত দেবে বলল ?"

রতন জবাব দেবার আগে ভেবে নিল। মাকে বলা মানেই কাকাকেও বলা। মাইনের টাকা কাকার হাতেই তুলে দিতে হবে। এখনকার মতো তখনও প্রতি ব্যাপারে কাকার কাছে হাত পেতে চাইতে হবে। এটা আর সে চায় না। কিছু টাকা সে নিজের কাছে রাখবে।

"বলল তো ষাট টাকা আপাতত দেবে।" রতন কুড়ি টাকা সরিয়ে রেখে যে গ্লানিটুকু বোধ করল সেটা কাটিয়ে দিল এই ভেবে, চুরি তো করছি না, এটা নিজের পরিশ্রমের টাকা।

বিষ্ণু বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। কাগজটা দুলাল চাটুজ্জের। উপরে গিয়ে সে কাগজ নিয়ে আসে। মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে বিষ্ণু বলল, "হল কিছু ?"

"হ্যাঁ।"

"প্রেসের কাজ ?"

"না, অফিসের।"

"আমাদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেসটিজ্ঞেস করল ?"

"না।"

"কত দেবে বলল ?"

"ষাট টাকা।" বলার পর রতনের মনে হল কাকা যদি বর্ধনপ্রেসে গিয়ে মাইনের অঙ্কটা যাচাই করে ?

"আমি এটাই ভেবে ছিলুম। আমাদের অফিসে পিওনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হল সত্তর টাকায়।"

কাকা ভেবে রেখেছিল সে পিওনের পর্যায়ের একটা চাকরি পাবে। রতনের বুকটা দমে গেল। তাকে পিওনের থেকে উঁচু জায়গায় রাখার কথা কাকা

ভাবতে পারে না।

"দোকানটার একটা খদ্দের পেয়েছি। চার হাজার অফার করেছে, টেলারিং দোকান করবে। আমি বলেছি ছ' হাজার, মনে হয় পাঁচ হাজারে রফা হবে।"

রতন চুপ করে রইল। তার কিছু বলার নেই।

"দুটো দায় ছিল আমার ওপর তার একটা আজ চুকে গেল, বাকি রইল মানুর বিয়েটা। এবার থেকে তোকে নিজেই নিজের পথ দেখে নিয়ে চলতে হবে। রোজগেরে হওয়া মানে সাবালক হওয়া। চাকরিটা যাতে থাকে সেইভাবে চলবি আর অন্য কিছু করার তো যোগ্যতা তোর নেই, এটাই তোর সম্বল। একটা যে ভুল করেছিস তার খেসারত তো দিতে হবে। আর যেন ভুল কাজ করিসনি। বি এ পাসটা করতে পারলে বলার মতো একটা চাকরি পেতিস।... বরাত।"

রতন মাথা নামিয়ে মেনে নিল কথাটা। সে এর পর থেকে বরাতের উপর নির্ভর করে সংসার ও সমাজের এক ধারে সরে গিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত একটা কোণ বেছে নিজের মুখোমুখি হয়ে দিন কাটাতে শুরু করল। কলকাতা শহরে, ভারতে, বিশ্বে কত কী ঘটনা ঘটে চলেছে সে তাতে আগ্রহী হয় না, ঘটনাগুলো তার মধ্যে সাড়া জাগায় না। বর্ধন প্রেসে যায়, ফেরার পথে চৈতন্য লাইব্রেরি থেকে বই বদল করে। অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে। মানসীর বিয়ে হয়েছে বেহালায়। এখন ঘরে তারা মাত্র দু'জন, মা আর ছেলে। উমা কথা কম বলে। রতন সেজন্য মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। যে কোনও বিষয়ের বই তাকে আগ্রহী করে। সে অক্ষরের নীরব রাজ্যে ভ্রমণ করতে ভালবাসে। রেডিও, সিনেমা বা খেলার মাঠ তাকে টানে না। যৌবনেই সে যেন প্রবীণ হয়ে পড়েছে। বাড়ি থেকে সে বেরোতে চায় না তবু মাকে নিয়ে মাঝে মাঝে যেতে হয় দিদির বাড়ি কিংবা দক্ষিণেশ্বরে কালী দর্শন করাতে। দিদিকে তার সুখী মনে হয়, এখন সে দুই ছেলের মা।

কখনও তার বন্ধুবান্ধব ছিল না, এখনও নেই। অনেকের সঙ্গেই তার আলাপ, ভাল সম্পর্কও, তবে ঘনিষ্ঠতা নেই কারুর সঙ্গে। এক এক সময় সে ক্লান্ত বোধ করে। ইচ্ছে করে হইচই করতে। একদিন সে সন্ধ্যাবেলা দেখেছিল তারই বয়সী একদল ছেলে নাচতে নাচতে শেয়ালদা স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। কয়েকজনের খালি গা, জামায় বোতাম নেই অনেকের, পায়ের চটি খুইয়েছে দু-তিনজন। একজনের গায়ে জড়ান লাল-হলুদ রঙের ক্লাবের পতাকা। ওরা কলজে ফাটিয়ে চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিচ্ছে ক্লাবের নামে। রতনের শরীর সিরসির করে উঠেছিল উত্তেজিত তরুণদের দেখে। প্রাণ-মন দিয়ে জড়িয়ে পড়লে তবেই এমনভাবে প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে। সেদিন রতন কয়েক মিনিটের জন্য বিষণ্ণ হয়েছিল, গভীরভাবে কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে না পারায়। জড়িয়ে না পড়লে জীবনে অনেক ফাঁক থেকে যায়। সেই ফাঁকগুলো দিয়ে ব্যর্থ হওয়ার বোধ ঢুকে পড়ে মনে জমা হয়। কিন্তু সে ব্যর্থ

কোথায় ? মাইনে দুশো টাকায় পৌঁছেছে, সংসারে অশান্তি নেই, তার নিজের কাজে সে সন্তুষ্ট, বড় ধরনের অসুখবিসুখ হয়নি। বরাতে যেমন আছে তাই হয়েছে !

ছয়

বোধহয় বরাতে ছিল বলেই দেখা হয়ে গেল শিবির সঙ্গে, আট বছর পর।

রতন শেয়ালদা স্টেশনে ঢোকার বড় ফটকের কাছে বসা পেয়ারাওলার ঝুড়ির উপর ঝুঁকে পেয়ারা বাছছিল। তার পাশে একজন এসে পেয়ারা তুলে বলল, "কত করে জোড়া দিচ্ছ ?"

রতন শুনল মেয়ের গলা আর দেখল হাতের চামড়ার রঙ কালো।

"দু আনা জোড়া।"

"ইস্‌স্‌ এইটুকু টুকু কিনা দু-আনা জোড়া, ছ পয়সা জোড়া করো, তাহলে দু জোড়া নোব।"

"দু আনা জোড়া কি কম বললাম নাকি ? অন্য পেয়ারাওলার কাছে যান দশ পয়সার কম দেবে না।"

রতন একজোড়া বেছেছে। দরাদরিতে যদি ছ পয়সা হয়, এই আশায় পাশে দাঁড়ানো মেয়েটিকে উসকে দিতে বলল, "ছ পয়সাই দাম হওয়া উচিত। আপনি ঠিকই—।"

চিনতে তার ভুল হয়নি। অমন কাচের মার্বেল গুলির মতো ঝকঝকে গোল গোল চোখ কখনও ভোলা যায়।

"ওই দ্যাখো, উনিও ছ পয়সা—।" শিবি পাশের লোকটির দিকে তাকিয়েই চোখ কুঁচকোল।

"চিনতে পারছ ?"

হাসি ছড়িয়ে পড়ল শিবির মুখে। "কেন চিনতে পারব না। শেষ দেখেছিলুম ন্যাড়া আর এখন কত চুল !...একটু ভারী হয়েছ।"

"বাবা মারা যাওয়ার পর আট বছর কেটে গেছে। ভারী হতেই পারি।"

"আট বছর ! সময় কীরকম দেখতে দেখতে কেটে যায়...কি গো ছ পয়সায় দেবে ?"

"দু জোড়া নেবেন ?"

"হ্যাঁ।... ওর এক জোড়া, তাহলে মোট সাড়ে চার আনা।" শিবির হাতে একটা হাতে তৈরি পুঁথির ব্যাগ। তার থেকে রুমাল বার করে পয়সা খুঁজতে আঙুল ঢোকাল। ততক্ষণে রতন পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে পেয়ারাওলাকে দিয়েছে। তাই দেখে শিবি কপট রাগে চোখ পাকিয়ে বলল, "দিলে কেন ? ভেবেছিলুম অ্যাদ্দিন পর দেখা হল, তোমাকে খাওয়াব।"

শিবির চোখ একই রকম রয়ে গেছে। বাবার মারা যাবার খবর শোনার

সময়...'সেদিন বানিয়ে যা বলেছিলে তাই সত্যি হল', ...ওর চোখ এমন করে বড় হয়ে উঠেছিল। রাগে, দুঃখে, খুশিতে এই চোখ দুটো একই রকম ভাষায় কথা বলে ওঠে।

"আমিও তো ভেবেছি তোমাকে খাওয়াব।"

"এত দিন পর দেখা হলে আরও ভাল জিনিস খাওয়াতে হয়। আমার কাছে পয়সা থাকলে সন্দেশ খাওয়াতুম।" শিবি তিনটে পেয়ারা ব্যাগের মধ্যে রাখল।

"খাওয়াব, চলো।" রতন ফেরত পয়সা হাতে নিয়ে গুনতে শুরু করল।

"আজ নয়। আমার তাড়া আছে। তুমি এখন করছ কী ?" পেয়ারায় কামড় বসাল শিবি। রতন দাঁতগুলো দেখল খইয়ের মতোই রয়েছে। "বেশ ডাঁসা, খেয়ে দ্যাখো।"

"চাকরি করছি, এই তো এখানে বর্ধন প্রেসে।" রতন যেদিকে হাতটা তুলল শিবি মুখ ঘুরিয়ে সেই দিকে তাকাল।

"কদ্দুরে, চলো দেখে রাখি।"

"চলো।"

হাঁটতে হাঁটতে শিবি বলল, "তোমার পরীক্ষা ভাল হয়েছিল তো ?"

"হয়েছিল।"

"আমার মন বলেছিল পরীক্ষা ভাল হবে। তার পর আর পড়োনি ?"

"না। চাকরিটা পেয়ে গেলুম।...তোমার খবর কী, এখন করছ কী ?"

"কিচ্ছু না। লেখাপড়া জানি না, জানলে চাকরি করতুম।"

"মা ?"

"সেই একই কাজ করছে আয়াগিরি...লোককে বলে নার্সিং। আমাকেও এই কাজে ঢোকাতে চেয়েছিল। লোকের গু-মুত পরিষ্কার করা আমার দ্বারা হবে না বলে দিয়েছি।"

"এখানে কী জন্য এসেছিলে ?"

"মহাজনের কাছে। বাড়িতে বসে রুমাল হাতে সেলাই করি। মাল দিতে এসেছিলুম বৌবাজারে। বড় একঘেয়ে কাজ, চোখ টনটন করে।" পেয়ারাটা শেষ হয়ে গেছে শিবি আঁচলে হাত মুছল। রতন লক্ষ করল শাড়িটা তাঁতের, হাতের দুগাছা চুড়ি বোধহয় ব্রোঞ্জের। রুপোর আংটিতে লাল পাথর, দেখেই বোঝা যায় পাথরটা নকল। নখে রঙ।

"সেই বাড়িতেই আছ ?"

"তা ছাড়া আর কোথায় থাকব ! পঁচিশ বছর আমরা ভাড়া আছি। এই বাড়িতেই জন্মেছি।...আর কদ্দুর ?"

"ওই তো, সাইনবোর্ডওলা বাড়িটা, ওর দোতলায়।" রতন আঙুল দিয়ে ইংরাজিতে লেখা সাইনবোর্ডটা দেখাল। শিবির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝে গেল পড়তে পারছে না। "বর্ধন প্রেস লেখা রয়েছে।"

"তোমার নাম করলে দেখিয়ে দেবে ?"

"ওই দরজা দিয়ে ঢুকে যাকেই বলবে রতন রায়ের কাছে যাব, সেই সিঁড়ি দেখিয়ে দেবে। ছ'টা সাতটা পর্যন্ত থাকি।"

শিবি চলে যেতেই রতন প্রেসের দিকে পা বাড়িয়েছে। সেই সময় সঞ্জিতবাবুর চায়ের দোকান থেকে "রতন" বলে ডেকে বেরিয়ে এল অমিয়। কানের কাছে চুল পেকেছে। পেটটা থলথল করছে চর্বিতে। তালু থেকে মৌরি মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

"কে রে ?"

"চেনা মেয়ে, পাড়ায় থাকে।"

"কতটা চেনা ?" অমিয় মৌরি চিবোতে চিবোতে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল।

"সামান্যই।"

"কালো হলেও দেখতে বেশ, গড়নটাও ভাল।...তা সামান্য চেনা মেয়ে এখানে কেন ?"

অমিয়র বলার ভঙ্গি রতনকে বিব্রত করল। প্রায় কৈফিয়ত দেবার মতো স্বরে সে বলল, "রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অমিয়দা। বলল কোথায় কাজ করো দেখব। তাই—।"

"তাই... ওরে মুখ দেখে সব বুঝতে পারি। তোকে তো নিরীহ গোবেচারা বলেই জানি! থাক্ থাক্ আর সাফাই গাইতে হবে না।...মুখে কী গদগদ ভাব! চলনের কী ভঙ্গি এই বুঝি গায়ের ওপর পড়ে!...ওরে প্রেম আমিও করেছি বিয়ের আগে। লজ্জা পাচ্ছিস কেন, য়্যা, প্রেম করার বয়স হয়েছে, করছিস, এতে লজ্জার কী আছে ?" অমিয় সবজান্তার হাসি হেসে রতনের পিঠে চাপড় দিল।

অমিয়র কথাগুলো রতনকে ব্যস্ত রাখল অবসর সময়ে তার মুখে কী ফুটে উঠেছিল যা দেখে অমিয়দার মনে হল সে শিবির প্রেমে পড়েছে! আট বছর পর আচমকা দেখা, বড়জোর মিনিট পনেরো তারা পাশাপাশি রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, হেঁটেছে। তার মধ্যেই সে প্রেমে পড়ে গেল! তাই কখনও হয় নাকি ? কিন্তু অমিয়দার চোখ বড় সাংঘাতিক। বছরপাঁচেক আগে বলেছিল, 'ওই রবি লোকটা সুবিধের নয়, সাবধানে থাকিস। তোকে পছন্দ করে না।' পরে সে জেনেছে, রবি তার নামে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে চুকলি কাটে।

রাতে অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে রতন ভেবেছে রাস্তায় আটা কুড়োনো থেকেই শিবির জন্য প্রথম তার দুর্বলতা তৈরি হয়েছিল। তারপর ওর চোখে নিজেকে তালেবর বানাবার জন্য জার্মানি যাব বলায় শিবির প্রতিক্রিয়াটা তাকে আরও দুর্বল করে দেয়— আচমকা গালে চুমু আর 'বিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু' কথাটা মাথার মধ্যে ইলেকট্রিক শক দিয়েছিল। নয়তো সেদিন কাদের সঙ্গে শিবি চিত্রলেখায় সিনেমা দেখতে যাচ্ছে জানতে কেন সে সিনেমা হলের

কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ? সাজগোজ করা শিবিকে ভেলোদা নামের লোকটার সঙ্গে দেখে তার অভিমানের মতো হয়েছিল কেন ? আট বছর পরও সে সেদিনের শিবির হাসি, কপট রাগ নিয়ে তাকানো ছবির মতো আজও দেখতে পাচ্ছে কেন ? সেদিন বুকের মধ্যে একটা ফোঁপানি উথলে উঠছিল, কেন ? এতগুলো কেন-র কারণ খুঁজতে খুঁজতে সে অনুভব করল তার জীবনে অনেক কিছুই হয়নি। তার বয়সী একটা ছেলের ভাল লাগে একটি মেয়ের সঙ্গ, যা পাওয়ার সুযোগ কখনও হয়নি। শিবির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে অনুভব করেছিল তার একটা চাহিদা আছে। এই একবগ্গা জীবনটা আর ভাল লাগছে না, এটাকে একটু অন্যরকম পথে নিয়ে ফেলা দরকার।

রতনের মনে পড়ল, শেয়ালদা স্টেশনের দিকে উদ্দাম নেচে, উল্লাসে চিৎকার করে মুখে ফেনা তুলে খালি গায়ে খালি পায়ে এগিয়ে যাওয়া একদল তরুণকে। সে দাঁড়িয়ে দেখছিল একজনের গায়ে জড়ানো ছিল ক্লাবের পতাকা। সে ভাবল, গভীরভাবে একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরলে জীবনের কিছু ফাঁক হয়তো ভরাট হবে। এতকাল পর শিবিকে দেখামাত্রই বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছিল। সে কি এতদিন অনুভব না করা ব্যর্থতাকে ভরাট করার একটা আশা পেয়েছিল শিবিকে দেখে ! তার অন্তরের অন্তঃস্থলে তাহলে কি তলানির মতো শিবি এত বছর ধরে ছিল ? জীবনকে আত্মসাৎ করতে হলে ওই ক্লাব পতাকার মতো কিছু একটার সঙ্গে নিজেকে জড়ানো বোধহয় দরকার। তার হৃদয় নেচে উঠেছিল শিবির বলা 'কেন চিনতে পারব না' শুনে। বরাত দেখা করিয়ে দিয়েছে ওর সঙ্গে। আট বছরে মানুষের চেহারায় কত পরিবর্তন হয় তবু শিবি তাকে চিনতে পেরেছে ! আমাকে ওর মনে আছে, রতন ঘুমিয়ে পড়ার আগে বারবার নিজেকে বলল, আমাকে ও ভোলেনি।

সাতদিন পর, দুপুরে ফোন বেজে উঠতে রবি বলল, "রতন ধরো"। জ্যাঠামশাই বাড়িতে, রতন হাতের প্রুফ রেখে দিয়ে উঠে গেল। ক্যালকাটা পেপার হাউস থেকে ফোন করেছে ঠেলাগাড়ির চাকা ভেঙে গেছে লরির ধাক্কায় আজ আর কাগজ পাঠানো যাবে না।

"কাল সকালে না পাঠালে কিন্তু ছাপা বন্ধ থাকবে, পার্টি আমাদের বাপান্ত করে ছাড়বে। অবশ্য কাল সকালেই চাই। ...তা তো বুঝলুম, অ্যাক্সিডেন্টের ওপর আপনাদের হাত নেই, কিন্তু পূরবী পাবলিশার্সকে তো আমাদের বোঝাতে হবে। ...আচ্ছা নমস্কার।"

ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়িয়েই রতন থ হয়ে গেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শিবি আর চশমার ফাঁক দিয়ে রবিবাবু তাকিয়ে ওর দিকে।

"তুমি !"

"আসব ?"

"এসো এসো।" রতন চট করে রবির মুখটা দেখে নিল। "বসো।"

আঁচল টেনে গায়ে জড়িয়ে শিবি তার সামনের চেয়ারে বসল। মুখে লাজুক

হাসি। "দেখতে এলুম তোমার আপিস।" মুখ ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকে সে চোখ বোলাল।

কী করবে ভেবে পাচ্ছে না রতন। ঘরটা অগোছাল হয়ে রয়েছে, নোংরাও। তবু ভাল মাস কয়েক আগে কলি করা হয়েছে, দরজা-জানলা, কড়ি বরগায় রঙ পড়েছে। কিন্তু চেয়ার টেবিলগুলো প্রথম দিন এসে যা দেখেছিল সেইরকমই রয়ে গেছে।

"কেমন দেখছ ?"

শিবি নিচু গলায় বলল, "এটা তোমার টেবিল ?"

"হুঁ।"

"তুমি ফোন করো ?"

"হুঁ।"

"বাইরে যেতে দেয় ?"

"দেবে না কেন ! বাইরে কাজ থাকলে তো যেতেই হয়।"

"ছাপা হয় কোথায়, নীচে ? বড় বড় মেসিন দেখলুম।"

"সব নীচে হয়। নীচে গোডাউনও আছে। রাস্তার ওপারে যে বাড়িটা দেখছ ওটা কেনা হবে। ভেঙে ফেলে নতুন করে বাড়ি হবে। সেখানে নতুন অফসেট মেসিন বসবে। এই বাড়ি থেকে সব মেসিন ওই বাড়িতে উঠে যাবে।" বলতে বলতে রতন দেখল শিবির চোখমুখে সমীহ ফুটে উঠেছে।

"ওই টেবিলে কে বসে ?"

"জ্যাঠামশাই,... মালিক।"

"তোমার জ্যাঠামশাই মালিক !"

রতনের ভাল লাগল ওর অবাক হওয়ার পরিমাণটা দেখে। বিশ্বাস করতে পারছে না সে মালিকের ভাইপো।

"শুধু দেখতে এসেছ, না এদিকে অন্য কাজেও এসেছ ?" রতনের অস্বস্তি লাগছে কয়েকবার রবির তাকানোয়।

"মহাজনের কাছে গেছলুম দেখা পেলুম না। তারপর ভাবলুম যাই সন্দেশ খাওয়াবে বলেছিলে খেয়ে আসি।"

"তাহলে চলো খেয়ে আসি।" বলেই রতন উঠে দাঁড়াল। অফিসঘরে একটা মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি বসে থাকলে লোকে কতরকম ভাববে। রবিবাবু ছাড়াও তো আছে অমিয়দা, যখন তখন এসে পড়ে। শিবিকে বসে থাকতে দেখলে পরে মুখ ছোটাবে। তবু রক্ষে জ্যাঠামশাই এইসময় থাকে না।

"রবিবাবু আমি এখুনি আসছি।"

শিবিকে নিয়ে সে হ্যারিসন রোডে এল। শেয়ালদার দিকে অনেকগুলো মিষ্টির দোকান আছে। যে দোকানে ভিড় নেই রতন সেটাই বেছে নিল। এবার তারা পাশাপাশি। দোকানের বাচ্চা ছেলেটা কাছে এসে দাঁড়াল।

"সন্দেশ বলি ?"

"সন্দেশ ভাল লাগে না।"

"বাহ্, সন্দেশ খাবে বলে এলে আর এখন বলছ ভাল লাগে না!"

"মিষ্টি আমার ভাল লাগে না।"

"তাহলে কী খাবে? মিষ্টির দোকানে তো মিষ্টিই পাওয়া যাবে। আগে জানলে রেস্টুরেন্টে যাওয়া যেত।"

"পরে যাবখন। আচ্ছা সন্দেশই বলো।"

'পরে যাবখন বলল কেন? তাহলে শিবির সঙ্গে আবার দেখা হবে? রতনের মাথার মধ্যে এক ঝলক হাওয়া ঢুকে পড়ল। ছেলেটাকে সে বলল, "চারটে কড়াপাকের তালশাঁস, আট আনাওলা, নিয়ে আয়।"

"এক জায়গায়?"

"হ্যাঁ।"

"আমি একাই চারটে খাব নাকি? না না, পারব না।"

"না পারলে আমি খাব।"

একটা প্লেটে চারটে সন্দেশ দিয়ে গেল। দুজনেই সন্দেশ তুলল, শিবি তারটায় কামড় দিল, রতন হাতে ধরেই রইল।

"খাচ্ছ না যে?"

"খাচ্ছি।"

রতন বলল বটে কিন্তু মুখে দিল না। সে শিবির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রইল। সন্দেশটা শেষ হতে শিবি আর একটা তুলে অল্প একটু কামড়েই বলল, "আর খেতে ভাল লাগছে না।"

রতন অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার করে বসল। হাতের সন্দেশটা রেখে সে শিবির হাত থেকে সন্দেশটা নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিল। চমকে শিবি বলল, "আমার এঁটো খেলে?"

"খেলে কী হয়েছে?"

"তুমি বামুনের ছেলে!" অপ্রতিভ দেখাল শিবিকে।

"জাতটাত আমি মানি না।" অনেকটা এই গলাতেই একদিন সে শিবিকে বলেছিল, 'গুরুর জন্য ছাত্রদের এটা করা কর্তব্য।' টেবলে রাখা শিবির পুঁতির ব্যাগটা তুলে সে খুলল। রুমালটা বার করে বাকি সন্দেশ দুটো তাতে মুড়ে ব্যাগে ঢোকাল। "বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাবে। নাও এবার ওঠো, অফিস যেতে হবে।"

দোকান থেকে বেরিয়ে রতন বলল, "এখন বাড়ি যাবে তো? চলো বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

"মহাজনের কাছে আর একবার যাব, এসেছে কি না দেখি, রুমাল দেবার কথা আছে।"

"ফিরবে কখন?"

"পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা তো হবে।"

“আমারও তো ছুটি ওই সময়ে হয়। ভালই হল, একসঙ্গে ফেরা যাবে। আমি তাহলে ওই মোড়ের ট্রাম স্টপে পাঁচটার সময় অপেক্ষা করব। একসঙ্গে যেতে আপত্তি নেই তো ?” রতন অনিশ্চিত হয়ে লক্ষ করল শিবির মুখভাব। অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছেটা সে অনেকটা খুলেই বলল, শিবি বোকা নয় এবার প্রশ্রয় দেয় কিনা সে দেখতে চায়।

“যদি আটকে না পড়ি, কথা দিতে পারছি না।” প্রশ্রয়ের কোনও চিহ্ন শিবির মুখে নেই।

“তাহলে থাক। ...কাজ রেখে এসেছি, আমি যাই ?” রতন যাওয়ার অনুমোদন পেতে শিবির ঘাড় নাড়ার জন্য অপেক্ষায় রইল।

“পাঁচ-দশ মিনিট দাঁড়িয়ে দেখো যদি এসে পড়ি।” এক হাত তুলে ঘাড়ের কাছে খোঁপাটা নেড়ে ঠিক করে বসিয়ে শিবি সাদামাটা গলায় বলল, “আমি যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।”

তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে শিবি দ্রুত পায়ে শেয়ালদার ভিড়ে মিলিয়ে গেল। রতন ফিরে আসতেই রবি ব্যস্ত হয়ে বলল, “রতন, ডেন্টাল কলেজে এখুনি যাও। ওদের স্যুভেনিরে কী সব ছাপার গোলমাল বেরিয়েছে। প্রিন্সিপালের লেখায় থার্ড প্যারার জায়গায় অন্য ম্যাটার বসেছে... কি প্রুফ দেখেছ ?”

“আমি তো ঠিকই দেখেছি! তাহলে মেক-আপের সময় চালাচালিতে গণ্ডগোল হয়েছে।”

“সেটা তো ওরা বুঝবে না। দোষ তো আমাদেরই। অক্ষয়বাবু শুনলে খেপে যাবেন। তুমি একবার যাও... টাকা দেবে না বলেছে।”

দু গ্যালি প্রুফ দেখা বাকি ছিল, ঝড়ের বেগে কারেকশন করে সে বেরিয়ে পড়ল। প্রায় পাঁচটা বাজে। স্যুভেনিরে যা ভুল হয়েছে তাতে মাপ চেয়ে পার পাওয়া যাবে না। কাঁচুমাচু হয়ে বোঝাতে হবে যাতে সব টাকাটা আটকে না দেয়। কীভাবে বোঝাবে তাই ভাঁজতে ভাঁজতে রতন ডেন্টাল কলেজে পৌঁছল। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সেখানে শুনল তাকে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হবে, অ্যাকাউন্ট্যান্টবাবু খুব ব্যস্ত।

রতন অনেকভাবে চেষ্টা করেও বোঝাতে পারল না। তাকে শুনতে হল, “লেখাটাকে হাস্যকর করে দিয়েছেন। আপনারা অন্ধের মতো কাজ করবেন আর আমরা দেব গুণাগার ?... ওনার প্রবন্ধটা আলাদা করে ছেপে দেবেন বলছেন কিন্তু বিলি করব কার কাছে ? যারা স্যুভেনির পেয়েছে তাদের নাম ঠিকানা কি আমরা লিখে রেখেছি !”

রতন মুখ কালো করে, তিক্ত হতাশ মনে প্রাচী সিনেমার সামনে ট্রাম স্টপে দাঁড়াল। ছ'টা বাজে। শেয়ালদার ট্রাম স্টপে শিবির এখনও আর দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। অফিস ছুটির ভিড় প্রত্যেক ট্রামে, পাদানিতে লোক ঝুলছে। বাসেরও একই অবস্থা। তবে এখানে বেশ কিছু লোক নামে শেয়ালদার সাউথ স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য।

তখন চেষ্টা করে ওঠা যায়। রতন গ্যালিফ স্ট্রিট বোর্ড দেখে একটা ট্রামের দিকে এগিয়ে গেল। পাঁচ-ছ'জন নামল, ওঠার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু করল অন্তত আটজন। হ্যান্ডেল ধরতে পেরেছিল পা রাখার জায়গাও রতন পেয়ে গেল। একটু পরে এক ধাপ উঠে দাঁড়াল।

ট্রাম পরের স্টপ হ্যারিসন রোডের মুখে এল। নর্থ স্টেশনে যাবার জন্য নামল কিছু লোক। কিছু লোক ঠেলে উঠল। ট্রাম ছাড়ার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল রতনের। শিবি দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টপে। দেখামাত্র সে ভিড় ঠেলে নামতে এগোল। বিরক্ত ক্রুদ্ধ মন্তব্য হল, "এতক্ষণ কি ঘুমোচ্ছিলেন নাকি মশাই ?" "যত্তোসব পাড়াগাঁইয়া, ওঠে কেন ট্রামে !" রতন যার পা মাড়াল সে পাঁজরে ঘুঁষির মতো ধাক্কা দিল, ট্র্যাফিকের ভিড়ের জন্য ট্রাম মন্থর ছিল এইবার গতি বাড়াল আর তখনই রতন প্রায় ঝাঁপিয়ে নামল রাস্তায়। নিজেকে সামলাতে সামলাতে সে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল। চটপট উঠে দাঁড়িয়ে সে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা লোকেদের দিকে তাকিয়ে বলল, "লাগেনি"। তারপরই দেখল শিবি তার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

"দেখলুম তুমি দাঁড়িয়ে আছ তাই নামলুম।" হাসার চেষ্টা করল রতন।

"নামলে কোথায়, তুমি তো পড়ে গেলে।" শিবি উৎকণ্ঠিত চোখে রতনের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে দেখল। রতন দু হাতের তেলো থেকে রাস্তার ধুলোময়লা ঝাড়তে শুরু করল।

"ব্যালান্সটা ঠিকমতো রাখতে পারিনি। ... হঠাৎ স্পিড নিল—"।

"হয়েছে আর সাফাই গাইতে হবে না। ধুতিটা তো ছিঁড়েছে, লোকেও তাকিয়ে আছে, হাঁটো।"

হাঁটতে গিয়ে রতন টের পেল ডান পায়ের গোছে যন্ত্রণা হচ্ছে। প্রায় কুড়ি গজ হেঁটে সে থেমে পড়ল।

"হাঁটতে পারছ না ? লেগেছে ?"

"মচকেছে বোধহয়।" রতনের মুখে কাতরতা ফুটে উঠল। সে হাঁটার চেষ্টায় পা ফেলেই "আহহ" করে উঠতে শিবি তার বাম বাহু শক্ত করে চেপে ধরল।

"থাক আর হেঁটে কাজ নেই।" খালি রিকশা নিয়ে যাচ্ছে এক বুড়ো রিকশাওলা। শিবি হাত তুলে ডাকল, "অ্যাই রিকশা, ইধার আও। ... দর্জিপাড়া যায়গা ? কেতনা লেগা ?"

"চার রুপৈয়া।"

"কেয়া ? চার রুপৈয়া !" শিবি আঁতকে উঠল। "এইটুকু পথ চার টাকা ? নেহি যায়গা। হরদম যাতা হ্যায় তিন রুপিয়ামে। দর্জিপাড়া তো কাছেই হ্যায়।"

"মাজি, দর্জিপাড়া বহত রাস্তা, তিন রুপৈয়ামে কোই নেহি যায়েগা।"

দরাদরি রতনের ভাল লাগে না। বিশেষত গরিব লোকেদের সঙ্গে। একটা

টাকা তার চার দিনের চায়ের খরচ, রিকশাওলার তাতে চার বেলা ছাতু খাওয়া হয়ে যাবে।

"সাড়ে তিন রুপিয়া দেগা, যায়েগা ?" রতন বলল।

"তুমি আবার কথা বলছ কেন ?" শিবি চাপাস্বরে প্রায় ধমকে উঠল। রতনের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে সে গলা নামিয়ে বলল, "আমি ডেকেছি ভাড়া আমি দোব। তোমার মতো বড়লোক তো নই ?" তারপর রিকশাওলাকে বলল, "বাবু বোলা সাড়ে তিন রুপিয়া, ব্যস, রাজি ?"

"উঠিয়ে।"

গায়ে গা লাগিয়ে কোনও তরুণীর সঙ্গে বসার সুযোগ রতনের জীবনে আগে কখনও আসেনি। রিকশায় বসার জায়গা খুব চওড়া হয় না। কিন্তু তারাও খুব চওড়া দেহের মানুষ নয়। সামান্য স্পর্শের, বেশি গায়ে গা লাগার দরকার না থাকলেও দুজনের দুটি কাঁধ ও বাহু যে একটু বেশিই স্পর্শ করে রইল সে ব্যাপারে কারুর হুঁশ নেই। রাস্তার গর্তে বা উঁচু হয়ে থাকা জায়গায় চাকা পড়লে রিকশায় বেশ জোরেই দোলা লাগে। তখন দুজনের কোমরের কাছে যে ধাক্কাটা লাগছিল সেটাও তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। দুজনে প্রথমে পুতুলের মতো দুটো মিনিট কাটাল। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, রক্ত চলাচল করছে। কিন্তু বেশিক্ষণ নির্বাক থাকা শিবির স্বভাবে নেই।

"অমন করে নামার কী দরকার ছিল ? সোজা বাড়ি চলে গেলেই তো পারতে !" শুকনো নিরাসক্ত স্বর। রতন আড়চোখে দেখল শিবি চোখ নামিয়ে হাতে ধরা একটা ছোট প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে। প্যাকেটটা এতক্ষণ সে লক্ষ করেনি।

"ওটা কী ? যা আনতে গেছলে ?" উত্তর দেওয়ার দায় রতন এড়াতে চায়। কেন যে নামার দরকার হল সেটা এখনও তার কাছে স্পষ্ট নয়।

"লেডিজ রুমালের কাপড়। ওরাই কেটে দেয়। চার ধারে মুড়ে হাত সেলাই করি।"

"দিনে কটা করো ?"

"অনেক।" অনিচ্ছুক গলায় উত্তর।

"ইচ্ছে করল নামতে, তাই নামলুম। ... কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে ?"

"বলতে পারব না। আমার হাতে তো ঘড়ি নেই।" এবার আর শুকনো গলায় উত্তর নয়। রতনের কানে অভিমানের মতো সুর বাজল। এবার কৈফিয়ত দেওয়ার সময় হয়েছে।

"হঠাৎই একটা খুব জরুরি কাজে যেতে হল দাঁতের হাসপাতালে। অফিসের ব্যাপার, না বলা যায় না। সেখানেও বসে থাকতে হল আধঘণ্টার মতো—"

"থাক, ওসব শুনে আমার চোদ্দ পুরুষের মুখে জল পড়বে না। একঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। শেয়ালদার মতো জায়গায় একটা মেয়ে একা দাঁড়িয়ে

থাকলে কী হয় সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি ঘটে নেই... একটা লোক পাশে এসে দাঁড়িয়ে দর জানতে চেয়েছিল।" রাগে চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে কথাগুলো শিবি মুখ থেকে ফেলে দিল।

রতনের বুকের মধ্যে দরকারের বেশি বাতাস ঢুকে পড়ে ফুসফুসটাকে কোণঠাসা করে দিল। সে বিড়বিড় করে উঠল, "কী বলছ তুমি!... আমার জন্য তোমাকে এই অপমান সহ্য করতে হল।... ছি ছি। আর এরকম হবে না... মাপ চাইছি।" রতন চেপে ধরল শিবির ডান হাতের আঙুলগুলো। শিবির কঠিন হয়ে থাকা মুখ ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে দেখে সে তার মুঠোর চাপ বাড়াল। হাতটা অসাড় ঠাণ্ডা মনে হল তার। রাজাবাজারের মোড় পেরিয়ে সায়ান্স কলেজের কাছাকাছি, আধমাইলেরও বেশি পথ পেরিয়ে আসার পর রতন হাত সরিয়ে নিল। শিবি মুখ ঘুরিয়ে হাসল।

"হাসলে যে ?"

"এমনিই।" সে রতনের হাতটা টেনে উরুর উপর রাখল। পাশ দিয়ে বাস যাচ্ছে। রিকশায় নারীপুরুষ যাত্রী থাকলে অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে বাস থেকে তাকায়। রতন কিঞ্চিৎ সিঁটিয়ে রইল। বাসে যদি কোনও পরিচিত লোক থাকে! কীভাবে যেন শিবি বুঝতে পারল রতনের উদ্বেগ, ঠাট্টার সুরে বলল, "লজ্জা করছে নাকি ?"

কথাটা গাঁট্টার মতো রতনের মাথায় ঘা দিল। তার যে লজ্জা করছে না সেটা বোঝাতেই হাতটা তুলে নিয়ে শিবির পিঠে বেড় দিয়ে রাখল। এইভাবে সে অনেক পুরুষকে রিকশায় চেপে যেতে দেখেছে সঙ্গিনীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে। জড়াবার মতো সাহস রতনের হল না শুধু বাহুটা আলতো করে শিবির পিঠে ছুঁইয়ে রাখল।

"ব্যথাটা কমেছে ?"

"না হাঁটলে বুঝতে পারব না।"

"বাড়ি গিয়েই বরফ লাগাবে। রাতে চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে শোবে। সকালে যদি ব্যথা থাকে তাহলে আর আপিস যেয়ো না। বাড়িতে কে কে আছে ?"

"মা আর কাকা, দিদির তো অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে।"

"কাকিমা নেই ?"

"কাকা বিয়ে করেনি।"

"তুমিও কি কাকার মতো বিয়ে করবে না ?"

রতন চুপ করে রইল। শিবি উত্তর পাওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাল না। রতন পাল্টা জানতে চাইল, "তুমি তো এখনও বিয়ে করোনি, তোমার মা পাত্তর খুঁজছে না ?"

"না।"

"তোমার তো অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, একজনকে তো বিয়ে করে ফেলতে

পারো। এভাবে একা কদ্দিন থাকবে!"

"থাক, আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না।"

এরপর তাদের মধ্যে খুচরো কিছু কথা ছাড়া আর বাক্যালাপ হয়নি। বাড়ির দরজায় রতনকে হাত ধরে শিবি নামাল। পা ফেলেই রতন কাতরে উঠে বলল, "ব্যথাটা যেন বেশি লাগছে।"

কড়া নাড়তে দরজা খুলল উমা। শিবি তখন রিকশাওলাকে ভাড়া চোকাচ্ছে। উমার অবাক চাহনি দেখে রতন বলল, "পড়ে গিয়ে পা মচকেছে। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। বরফ চাই।"

বলতে বলতে রতন মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ির সদরে দাঁড়াল। শিবিকে নিয়ে এখন সে অস্বস্তিতে। রিকশায় বাড়ি ফেরার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু সঙ্গে একটি মেয়ে থাকলে প্রশ্ন উঠবেই—কে? শিবির কী পরিচয় সে দেবে!

"বরফ এখন কে আনবে? ঠাকুরপো আসুক।" উমা অসহায়ভাবে বলল। বাড়ি থেকে সে কখনও বেরোয় না, কোথায় বরফ পাওয়া যাবে তাও জানে না।

"আমি এনে দিচ্ছি, বড় রাস্তায় পানের দোকানেই পাওয়া যায়।" শিবির অচেনা নয় এই পাড়া। সে আর কথা না বাড়িয়ে চটপট বড় রাস্তার দিকে রওনা হল।

উমা বলল, "তোর সঙ্গেই এল, কে মেয়েটা?"

"যখন স্যারের বাড়িতে পড়তে যেতুম তখন থেকেই আলাপ, ওই পাড়াতেই থাকে।" এবার রতন তার জীবনের সবথেকে বৈপ্লবিক উক্তিটি করল, "শিবি আমার বন্ধু।"

ঘরে এসে রতন খাটে বসল। এই সংসারে দুর্ঘটনা কখনও উমা দেখেনি, পা মচকালে কী করতে হবে জানে না। গরম চুন-হলুদ লাগানোর কথা শুনেছে কিন্তু কখনও লাগাবার দরকার হয়নি। তার ছেলেমেয়েরা কেউই দুরন্ত ছিল না। উমা উৎকণ্ঠাভরে বলল, "বরফ লাগালেই সেরে যাবে? চুন-হলুদ লাগাতে হবে না?"

"হবে। শিবি আগে আসুক।"

নারকেল দড়িতে বাঁধা একখণ্ড বরফ হাতে ঝুলিয়ে শিবি ফিরল মিনিট পাঁচেক পরেই। বরফখণ্ডটা গামছায় মুড়ে মেঝেয় আছড়ে চুর্ন করে সে রতনের হাতে দিয়ে বলল, "পায়ে চেপে ধরে থাকো।" উমাকে বলল, "মাসিমা চুন আর হলুদ আছে?"

"হলুদ আছে কিন্তু চুন তো নেই, আমাদের ঘরে কেউ তো পান খায় না!"

"খায় না বললে তো হবে না, জোগাড় করুন। চুন-হলুদ গরম করতে হবে, একটা কলাইয়ের কি অ্যালুমুনিমের বাটি দিন।"

উপরের নমিতা পান খায়, উমা ছুটল চুন আনতে, হলুদ বাটা নেই। শিল

নোড়া পেতে শিবি হলুদ বাটতে বসল। তখনই বাড়ি ফিরল বিষ্ণু। নিজের ঘরের দরজা খুলতে খুলতে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। উমা বাটি হাতে দাঁড়িয়ে আর বাটনা বাটছে সেই মেয়েটা যাকে সে বাজারে মাছওলার সঙ্গে ওজন নিয়ে ঝগড়া করতে দেখেছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তেলেভাজা খেতে দেখেছে লোচ্চামার্কা ছেলেদের সঙ্গে। বিষ্ণু পাশের ঘরে ঢুকে দেখল রতন মেঝেয় বসে পায়ে বরফ ঘষছে।

"কী হয়েছে ?"

"ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেছি।"

"বাটনা বাটছে মেয়েটা কে ?"

কাকার গলার স্বর কড়া এবং চড়িয়ে বলা। রতন এবার বলতে পারল না 'আমার বন্ধু'। ক্ষীণভাবে বলল, "হাঁটতে পারছিলুম না, ওই আমাকে রিকশায় করে নিয়ে এল।"

"চিনিস ওকে ?" রুক্ষ গলায় বলা। বিষ্ণুর কথাগুলো রান্নাঘরে পৌঁছল।

"হ্যাঁ, অনেকদিন। স্যারের কাছে যখন পড়তে যেতুম তখন থেকে।"

"রাস্তা থেকে ধরে এনে রান্নাঘরে ঢুকিয়েছিস কেন ? অনেকদিন চিনি বললেই কি চেনা হয় ? রাস্তায় বাজারে হ্যা হ্যা করে বেড়ায়, তাকে একেবারে রান্নাঘরে তোলা ! ... বউদি, বউদি।" বিষ্ণু কর্কশ স্বরে ডাকল।

উমা আসতেই সে গলা চড়িয়ে বলল, "রান্নাঘর থেকে বেরোতে বলো। জাতটাত এখনও মানি, তোমরা না মানলেও, আমি মানি। তুমি কি জানো ও ডোম না মুচি ?"

পাংশু হয়ে গেল উমা এবং রতনের মুখ। গুপিনাথ বেঁচে থাকতেই রোজগেরে বিষ্ণু সংসারের কর্তা হয়েছিল এবং আজও রয়েছে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কথা বলে কেউ ওকে চটাতে চায় না। রতন চাকরি করলেও সংসারের হাল কাকার হাত থেকে নেওয়ার সাহস আজও সে অর্জন করতে পারেনি।

"কাকা একটু আস্তে বলো, ও মুচি ডোমের মেয়ে নয়, ভদ্রঘরের মেয়ে।" রতন অনুনয় জানাল।

"কেমন ভদ্রঘরের তা আমার দেখা আছে। বাজারে ঝগড়া করে, রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে সে আবার ভদ্দর ঘরের !" বিষ্ণু ভেংচি কাটার মতো মুখটাকে বিকৃত করল।

"মাসিমা," দরজার কাছে শিবি। শান্ত স্বরে বলল, "হলুদ বেটে গেলুম, চুনের সঙ্গে মিশিয়ে গরম করে লাগিয়ে দেবেন। আমি চললুম।"

ঘরের ভিতর এসে খাটের উপর রাখা প্যাকেটটা তুলে বেরিয়ে যেতে গিয়ে শিবি থমকে দাঁড়াল। ভারীমুখ চোখে আগুন, শিবি তীক্ষ্ণস্বরে বিষ্ণুকে বলল, "আপনি জানেন আমি ভদ্দর না ছোটলোকের ঘরের মেয়ে ? শুনিয়ে শুনিয়ে ঠেশ দিয়ে অনেক কথা তো বললেন, এখন আমি যদি বলি আপনি বিয়ে

করেননি ... মাগিবাড়ি যান।" শিবির ঠোঁট থরথর করছে উত্তেজনায়।

"কী বললে ? কী বললে ?" বিষ্ণু ঠকঠক কেঁপে উঠল। উমা আর রতন বিস্ফারিত চোখে শিবির দিকে তাকিয়ে। শিবির দু চোখ দিয়ে হলকা বেরোচ্ছে।

"যা বলেছি তা ঠিকই কানে ঢুকেছে। উপকার করতে রিকশা করে বাড়ি পৌঁছে দিলুম, বরফ আনলুম, হলুদ বেটে দিলুম আর তার বদলে শুনতে হল আমি মুচি ডোমের মেয়ে ?" বলতে বলতে শিবির গলা চড়ে উঠল। "এটা কি ভদ্দরলোকের বাড়ি ? আমি মেয়ে বলে তাই বলতে সাহস পেলেন, ছেলে হলে এক চড়ে দাঁতগুলো ফেলে দিত। ... অভদ্দর ছোটলোক ঘাটের মড়া কোথাকার।"

"শিবি কী বলছ ?" রতন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে শিবিকে দরজার দিকে ঠেলে দিল। "যাও তুমি এখন।"

"যাব না তো কি থাকতে এসেছি ? বাইরের একটা মেয়েকে গায়ে পড়ে অপমান করল, তার বেলা চুপ করে আছ কেন ? মেনিমুখো, মিচকেপোড়া।" ক্রুদ্ধ শিবির গলা এবার কান্নায় ভিজে উঠেছে। দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামল।

বিষ্ণু বলল, "আর নাটক করতে হবে না। ছেলে হলে আমিও—"

"কাকা !" রতন চেঁচিয়ে উঠল। "অনেক ছোটলোকমি করেছ, এবার চুপ করো।"

রতন যে এভাবে কাকার মুখোমুখি হবে সেটা বিষ্ণু কখনও কল্পনাতেও ভাবতে পারে না। সে স্তম্ভিত হয়ে ভাইপোর দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। শিবি পরিস্থিতি দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, "জেনে রাখুন আমি সোনার বেনের মেয়ে, ছোট জাত নই।" রতন জ্বলন্ত চোখে বিষ্ণুর দিকে তাকাল, বলার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

"তুই আমাকে অপমান করলি ! ছোটলোক বললি ? খাইয়ে পরিয়ে এত বড় করলুম, চাকরিটাও জোগাড় করে দিলুম আর কি না ... তুই একটা বেইমান, একটা কালসাপ ... আমাকে বলল কি না মাগিবাড়ি যাই ! আর তুই মুখ বুজে অমন কথা শুনে গেলি ? তোর নিজের কাকার থেকে ওই হারামজাদিটা বেশি আপন হল ?"

"তুমিই তো গায়ে পড়ে শুরু করেছিলে। আমিই ওকে নিয়ে এসেছি। কাউকে কি বাড়িতে আনার অধিকার আমার নেই ? চিরকাল কি তোমার তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে ?" রতন উত্তেজনা চেপে ক্ষোভ জানানোর ভঙ্গিতে বলল, "লেখাপড়া শিখে জাত তুলে কথা বলো !"

"বলি তো কী হয়েছে ?"

"হবে আবার কী, লজ্জায় মাথা কাটা যায়।"

"অঅঅ বাবুর লজ্জা হয়, তায় আমার মাথাও কাটা যায় ! কী দামি মাথা !

পরীক্ষায় টুকতে গিয়ে ধরা পড়ে যখন ফেল করিস তখন যে বংশের মাথাকাটা যায় রতনবাবু, সেটা মনে রেখো।”

রতনের মুখ পলকের জন্য ফ্যাকাসে দেখাল। উমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে চোখ নামিয়ে সে বলল, “এত বছর পর ওসব কথা তুলছ কেন?”

“তুলতে বাধ্য করলি। এই বলে রাখলুম, এই ছোটলোক মেয়েটা আর যেন এ বাড়ির চৌকাট না মাড়ায়। যদি কোনদিন ওকে দেখি তা হলে তোকেই ঘাড় ধরে এখান থেকে বার করে দেব আর নয় তো আমিই এখান থেকে চলে যাব। ... বউদি, অনেক করেছি তোমাদের জন্য আর আমি কিছু করব না।”

উমা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। বিস্ময়, ভয় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে শুধু দুজনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। রতনের চুল মুঠোয় ধরে ঠাসঠাস করে দু গালে চড় মেরে সে বলল, “মাপ চা, কাকার পায়ে ধরে মাপ চা।”

“না।” তার ভিতরে যে চাপ এতক্ষণ ধরে তৈরি হয়ে উঠেছে সেটা যেন বার করে দেবার চেষ্টাতেই বিকটভাবে রতন চিৎকার করে উঠল। তার চোখে উন্মাদের মতো চাহনি। বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে দাঁত চেপে বলল, “ভেবেছ কী আমাকে? যা খুশি ইচ্ছে চাপিয়ে দেবে আর তাই মেনে নিতে হবে মাথা নিচু করে? ওই মেয়েকে কালকেই আমি এ বাড়িতে নিয়ে আসব, দেখি তুমি কী করো!”

বিষ্ণু অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে থাকল। নিরীহ শান্ত ভাইপোকে সে যেন আর চিনতে পারছে না। একটা যুবতী মেয়ের জন্য ছেলেটা এতদূর উদ্ধত হয়ে উঠল! মুখের উপর অপমান করার জোর পেল কোথা থেকে? সে এগোল অলসভাবে। আচমকা বিশাল থাবায় রতনের ঘাড়টা ধরে তাকে ধাক্কা দিল। হালকা দুবলা রতন হুমড়ি খেয়ে ঘরের বাইরে দালানের মেঝেয় ছিটকে পড়ল।

“বেরো, এখনই বেরো।” বিষ্ণু আঙুল দিয়ে সদর দরজাটা দেখাল।

“ঠাকুরপো!” উমা আর্তনাদ করে বিষ্ণুকে জড়িয়ে ধরল। “আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি। ও ছেলেমানুষ, কাকে কী বলতে হয় জানে না। ওকে ছেড়ে দাও।”

উমার কথায় কান না দিয়ে বিষ্ণু নিজের ঘরে চলে গেল, তার পিছনে গেল উমা। রতন উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকে বরফগলা জল মাড়িয়ে খাটে বসল। এখন আর সে পায়ে ব্যথা বোধ করছে না। শরীরের মধ্যে একটা থরথরানি আর মাথার মধ্যে শক্ত করে এঁটে ধরেছে একটা সাঁড়াশি। আলতোভাবে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। তার চিন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। এলোমেলোভাবে সে হাতড়াতে লাগল একটা কোনও বিষয়কে ধরে ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিতে। পারল না। সে শিবির কথা ভাবল, বর্ধন প্রেসের চাকরির এবং মায়ের জন্য ভাবল। এই সংসার থেকে বেরোতে হলে কী করা

দরকার তাও ভাবল। এবং সবশেষে ভাবল বরাতে যা আছে তাই হবে।

"রতু চুন হলুদ গরম করে এনেছি, লাগাবি না ?"

"না। ব্যথা নেই আর।"

সাত

পরদিন সকালে রতন খুঁড়িয়ে হেঁটে সামনের বাড়ি গেল। ছোটুদা এখন হাওড়ার একটা কলেজে পড়ায়। বছর দুয়েক আগে ফোন নিয়েছে। বাইরের ঘরে ছোটুদা দুটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছিল। ওরা পড়তে আসে। রতন বলল, "একটা ফোন করব অফিসে।'

"করো।" টেলিফোনে তালা দেওয়া। চাবি দিয়ে ছোটুদা খুলে দিল।

অফিসে নয় অক্ষয় বর্ধনের বাড়িতে সে ফোন করল। পেয়ে গেল অক্ষয়কে। "জ্যাঠামশাই, কাল ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে পা মুচকেছে, হাঁটতে পারছি না।" রতন কখনও এর আগে ছুটি নেয়নি একমাত্র দিদির বিয়ের সময় ছাড়া। অক্ষয় তাকে সাত দিনের ছুটি মঞ্জুর করল।

"তোমার খবর কী রতন, আর তো দেখতেই পাই না।" ছোটুদা বলল। মোটা হয়েছে, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। এখনও বিয়ে করেনি।

"খবর আর কী, সেই থোড় বড়ি খাড়া জীবন, চলে যাচ্ছে।" রতন ভাবল, টেলিফোন কলের জন্য পয়সা দিতে গেলে ছোটুদা কি নেবে ?

"বড্ড তাড়াতাড়ি চাকরিতে ঢুকে গেলে। ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়তে পারতে।"

রতন কুঁকড়ে গেল 'ম্যাট্রিক পাস করে' শুনে। ছোটুদা জানে না তা হলে।

"ভাবছি প্রাইভেটে প্রি-ইউ দোব। ... আপনাকে কিন্তু তখন জ্বালাব।" রতন স্বস্তির হাসি মুখে ছড়াল।

"নিশ্চয় নিশ্চয়। তোমাদের সবাই ভাল আছে ? ... সেদিন হাওড়ার গুমটিতে তোমার ভগ্নিপতিকে দেখলুম, বোধহয় ওখানে স্টার্টার না টাইমকিপার কী একটা যেন।"

"আপনি কথা বললেন ?"

"না আমার তাড়া ছিল তা ছাড়া আলাপও তো নেই। দিদির আর বাচ্চাটাচ্চা হয়নি ?"

ফিরে আসার সময় সে কাকার সামনে পড়ল। বিষ্ণু তখন অফিসে বেরোচ্ছে। দু'জনেই নিথর চোখে সামনে তাকিয়ে পরস্পরকে অতিক্রম করল।

"মা চুন-হলুদটা একটু জল দিয়ে আবার গরম করে দাও।" চেঁচিয়ে কথাটা বলে রতন বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। এখনই যত রাজ্যের ভাবনার সময়। কাকাকে ছোটলোক বলে সে কি অন্যায় করেছে ? বাড়িতে বাইরের একটা

মেয়ে প্রথম এসেছে। তার সঙ্গে কোনও পরিচয়ই নেই, তার সম্পর্কে কিছুই জানে না অথচ তাকে বলেছিল মুচি না ডোম ! বলারও একটা ভঙ্গি থাকা উচিত। রান্নাঘরে ঢোকার জন্য কি জাত যায় ? অফিস করে, পাঁচটা লোকের সঙ্গে মেশে, বি এ পাস, তবুও কাকার মধ্যে আচার বিচার সংস্কার মানার ব্যাপারটা রয়ে গেছে ! এটাকে আঁকড়ে থেকে কী পায় ?

শিবি তার সম্পর্কে যা ধারণা করল সেটা তো সে বলেই দিল—'মেনিমুখো, মিচকেপোড়া !' মেনিমুখো কথাটার মানে কী ? ফট করে ও বলে দিল 'মাগিবাড়ি যান।' মেয়েদের মুখে 'মাগি' শব্দটা বিশ্রী শোনায়। শিবি একেবারেই লেখাপড়াটা করেনি, ভদ্র শিক্ষিতদের সঙ্গে মেশেনি। ওর বোধহয় ধারণা বিয়ে না করলেই পুরুষরা ওই সব জায়গায় যায়। কাকা যে যায় না, তা সে তামাতুলসী ছুঁয়ে বলতে পারে। আঘাতের পাল্টা আঘাত দেবার জন্যই ও বলেছিল আর লোকটা সম্পর্কে কিছু না জেনেই। অন্যায় করেছে শিবি। তবে প্রথম অন্যায়টা কাকার করা না হলে শিবি ফোঁস করে উঠত না।

রতন পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে শিবিকে নির্দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা করল চারদিন ধরে এবং তার মধ্যেই বুঝতে পারল, হোক সে অশিক্ষিত রুচিহীন, এই কালো মেয়েটাকেই সে ভালবেসে ফেলেছে। মনে দরদ আছে শরীরে আছে আকর্ষণ। শিক্ষা বা রুচি নিয়ে বাছবিচার করার ইচ্ছে তার ভেসে গেছে, জীবনে এই প্রথম একজনকে আঁকড়ে ধরে সে পুরুষমানুষের মতো তীরে উঠতে চায়।

পায়ে খুব সামান্যই ব্যথা। রতনের অসুবিধা হল না শিবিদের বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যেতে। দুপুরে নির্জন পাড়া। রাস্তায় কোনও চেনা লোকের সঙ্গে তার দেখা হল না। রতন দরজার কড়া নাড়ার আগে শিবিদের ঘরের জানালাটা খোলা দেখে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল জানলার দিকে মুখ করে শিবি খাটে বসে কথা বলছে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে। তাকে দেখে শিবি জানলায় উঠে এসে বলল, "কী চাই ?"

"কিছু না এমনিই...ইচ্ছে হল, তাই।"

চোখ কুঁচকে শিবি তাকিয়ে রইল। রতন অস্বস্তিভরে বলল, "সেদিনের ব্যাপারটা...কিছু বলার আছে।"

"দাঁড়াও।"

স্ত্রীলোকটি উঁকি দিল শিবির ঘাড়ের পেছন থেকে। রতনের মনে হল মুখটি যেন চেনা-চেনা ! সদর দরজা খুলে শিবি ডাকল, "এসো।"

তারা ঘরে আসতেই স্ত্রীলোকটি মেঝে থেকে সাত-আট মাসের একটা বাচ্চাকে কোলে তুলে বলল, "তাহলে আমি আসি রে সিবি। পরে আসবখন।"

'সিবি' শুনেই রতন চিনতে পারল। জানলা দিয়ে এই মেয়েটাই বলেছিল চিত্রলেখায় দেবানন্দের বই হচ্ছে। সেদিন ওরা দুজন আর তিনটে লোক

চিত্রলেখায় ম্যাটিনি শোয়ে গিয়েছিল। একজনের নাম ছিল ভেলোদা, সেই টিকিট কেটেছিল। মেয়েটার শরীর বাচ্চাটার মতোই অপুষ্টি আর অভাবের আঁচড়ে জিরজিরে।

"ঘরে থাকবি তো এখন ?" শিবি বলল।

"তা না হলে মরতে আর যাব কোথায় ?"

"সন্দের সময় পারলে যাব তোর কাছে।" শিবি ওকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোল। সদরে খিল দেওয়ার শব্দ হল। শিবি উঠোনের তার থেকে শুক্‌নো কাপড় আর সায়া তুলে ঘরে এল। ইতিমধ্যে রতন ঘরে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। এর আগে দু'বার সে এই ঘরে এসেছে আট বছর আগে। মনে হল তখন যতটা পরিপাটি আর যত জিনিসপত্র দেখেছিল এখন আর ততটা নেই। তোষক ঢাকা নীল চাদরটা ময়লা, বালিশের ওয়াড়ও তাই। রেডিওটা নেই। মশারিতে দুটো তাপ্পি। দেয়ালে কয়েক জায়গায় নোনা ধরেছে। অবস্থা খারাপ হওয়ার চিহ্ন ঘরে ছড়ানো।

"কী বলতে এসেছ ?...বসো।'

খাটে পা ঝুলিয়ে বসল রতন। শিবির ঠাণ্ডা স্বর আর চাহনি থেকে সে বুঝে গেছে রাগ পড়েনি। "যে এসেছিল তাকে যেন আগে দেখেছি।"

"দেখতে পারো। মঙ্গলা তো ভেতর দিকের আটাশ নম্বর বস্তিতে থাকে। রাস্তায় খুব ঘুরত। বস্তিরই মোনা নামে একটা ছেলেকে প্রেম করে বিয়ে করেছে।"

"রাস্তায় নয়, তোমার এই জানলায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল। মনে নেই আমি তখন ন্যাড়া মাথা, বাবার শ্রাদ্ধের ঠিক পরই ?" রতন আশা নিয়ে তাকাল।

কয়েক সেকেন্ড কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শিবি চোখ রাখল রতনের মুখে। "যেদিন তুমি বললে বিলেত না কোথায় যাবে ? ওখানে হপ্তায় দু'-আড়াই হাজার টাকা লোকে মাইনে পায় ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।"

"উড়োজাহাজে যাবে সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যাবে।" গলায় বিদ্রূপ শিবির।

রতনের মনে আছে, শিবি বলেছিল 'ঠিক ?' সেও বলেছিল 'ঠিক।' তখন আচমকা শিবি তার গালে চুমু খেয়ে বলেছিল 'এমনি যাব না, বিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে।' শিবির কি কথাটা এখনও মনে আছে ?"

"ও সব ছেলেবয়সের আবোলতাবোল স্বপ্ন, সবাই দেখে।" ঝেড়ে ফেলার মতো ভঙ্গিতে কোলের উপর বালিশ টেনে নিয়ে রতন তাতে চাপড় দিল। "তুমিও তো তখন বলেছিল, বিয়ে করবে আমাকে তবেই যাবে।" রতনের ঠোঁট ছড়িয়ে পড়ল।

"আমার মনে আছে। বয়স কম ছিল বলেই মনে আছে।" শিবির কঠিন ভাবটা নরম হয়ে এল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে বলল, "তখন কিছু

বুঝতুম না, সবই বিশ্বাস করতুম।”

“এখন করো না ?”

উত্তর না দিয়ে শিবি বলল, “কী বলতে এসেছ ?”

“কাকার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, কথা বলা বন্ধ। সত্যিই খুব অন্যায় করেছে তোমাকে ছোট জাত বলে।...ডোম মুচি বলা একদমই উচিত হয়নি। লোকটা বরাবরই ওই রকম, ছোটবেলা থেকেই তো দেখছি।...তুমি কিছু মনে কোরো না, হাত জোড় করে আমি মাপ চাইছি।” রতন করজোড়ে মিনতি জানাল।

“কে তোমার মাপের ধার ধারে !” শিবির গলার স্বর এখনও ঠাণ্ডা কিন্তু চোখে স্ফুলিঙ্গ বেরোল। রতন এই রকম উত্তরই পাবে আশা করেছিল।

“আমি শোধ নেব, তোমার কাকার থোঁতামুখ ভোঁতা করে দোব। আর তোমার এই নেকু নেকু কথাও আমি ঘোচাব। উঁচু জাত বলে অহঙ্কার ? জাতের বড়াই করা ?” শিবি কোমরে আঁচল জড়িয়ে গুঁজল।

“আমি কিন্তু জাতটাত মানি না।”

“মানি না !” ভেংচে উঠল শিবি। “যদি না মানো তা হলে আমার এঁটো খাও।” শিবি দু' পা এগিয়ে এসে রতনের সামনে দাঁড়াল। রতনের হাঁটুতে স্পর্শ করল শিবির উরু। “আমার এইখানে ঠোঁট ছোঁয়াও।” শিবি নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে দেখাল, “ছোঁয়াও।”

রতনের হতভম্ব হওয়ার কথা। কিন্তু হল না। এই হচ্ছে আসল শিবি। ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সে জেনে গেছে শিবির কাণ্ডজ্ঞানটা কম। কখন কোথায় কী বলতে বা করতে হয় সেই বোধটাই নেই। রতন হাসল।

বেড়ালের বিদ্যুদ্‌গতি থাবার মতো দুই কাঁধে দশটা নখ বসিয়ে তাকে টেনে ধরে হাঁ করে শিবি রতনের দুটো ঠোঁট মুখের মধ্যে ভরে নিল। এত অকস্মাৎ ব্যাপারটা ঘটে গেল যে, বিস্ময়ের ধাক্কায় রতন অসাড় হয়ে রইল। সে শুধু তীক্ষ্ণ ব্যথা পাচ্ছিল দুই কাঁধে আর ঠোঁট দুটো মনে হচ্ছিল ছিঁড়ে যাবে। আধ মিনিট পর শিবি রেহাই দিল। ঠোঁট চেটে রতন ঢোঁক গিলল। শিবি তার মুখের মধ্যে থুথু ঢুকিয়ে দিয়েছে। স্বাদটা নতুন, সে উত্তেজনা বোধ করল।

“কি গো বামনের ব্যাটা, ডোম মুচির মেয়ের থুতু তো গিললে। যাও এবার কাকাকে গিয়ে বলো !” শিবি হেসে উঠল। হাসি শেষ হবার আগেই রতন দু' হাতে শিবিকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, “তোমাকে আমি বিয়ে করব...করবে ?”

“এক্ষুনি করবে ? ...বলো ?”

“হ্যাঁ এক্ষুনি।” রতনের শরীরে যেন একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। ভুল বকার মতো সে বলল, “আমি মেনিমুখো নই...পুরুষমানুষ। কাউকে আমি ভয় পাই না।” শিবিকে সে ঠেলে সরিয়ে দিল।

“আমি পুরুষমানুষকে বিয়ে করব উঁচু জাতকে নয়। পৈতে

খোলো...খোলো।" শিবি দু' হাতে শার্টের গলা ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই দুটো বোতাম ছিঁড়ে শার্টের গলা ফাঁক হয়ে গেল। হাত ঢুকিয়ে শিবি পৈতেটা ধরে টেনে বার করল। হাতের কাছেই টেবিলের উপর রুমালের কাপড় আর সুতোর সঙ্গে রয়েছে একটা কাঁচি। হাত বাড়িয়ে শিবি কাঁচিটা তুলে নিয়ে, রতন বাধা দেবার আগেই, পৈতেটা কেটে দিল। শার্টের ভিতর থেকে ছেঁড়া সুতোর গোছা টেনে পরে নিয়ে সে নিজের গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে হি হি করে মজা পাওয়ার হাসি হেসে উঠল।

"এবার আমি বামুন হয়েছি...বামুন বামুন বামুন হয়েছি।" দু' হাত মাথার উপর তুলে সুর করে "বামুন বামুন" বলে, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে খ্যামটা নাচ শুরু করল শিবি। রতনের স্তম্ভিত ভাবটা কাটতে একটু সময় লাগল। সেদিনের অপমানের শোধ যে এইভাবে তুলবে সে বুঝে উঠতে পারছে না। শিবি তার কাছে অস্পষ্ট একটা হেঁয়ালি হয়ে উঠছে।

"আমি এসেছি মাপ চাইতে, আর তার বদলে কী ব্যবহার করলে!" রতনের গলায় রাগের বদলে নরম ক্ষোভ অনেকটা অভিমানের মতো ফুটে উঠল। শিবির নাচ থেমে গেল।

"খুব খারাপ ব্যাভার করেছি! যদি মারতে ইচ্ছে হয় তো মারো।" রতনের একটা হাত তুলে নিয়ে শিবি নিজের গালে আঘাত করল।

"ভদ্দরলোকেরা মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না।" যথাসাধ্য ভারিক্কি দেখাবার চেষ্টা করল রতন।

"তুমি ভদ্দরলোক? ভদ্দরলোকেরা কথা রাখে...কথা দিয়েছ এক্ষুনি বিয়ে করবে।"

"নিশ্চয় করব।" বলার সময় রতনের চিবুক একটু উঠল। স্বরে একটু তেজ এসে গেল। তাকে যেন শিবি পুরুষমানুষ ভাবে।

"ভদ্দরলোকেরা ধাপ্পা মারে।"

"আমি ধাপ্পা মারার লোক নই...বিশ্বাস করো, অন্তর থেকে বলছি।"

রতন দেখল শিবির মুখ মন্থরভাবে বদলে যাচ্ছে। যে চোখ নাক ঠোঁট বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলো যথাযথভাবে গুছিয়ে এসে মুখটাকে কুঁড়ি ভেঙে ফুটে ওঠা একটা ফুলের মতো করে তুলছে। কালো মার্বেলের মতো চোখ দুটোয় সন্ধ্যাবেলার স্তিমিত আলো ফুটে উঠছে। শিবি ঢোঁক গিলল, ওর গলার পেশীতে এক পশলা বৃষ্টি ঝাপটা দিল।

"তোমার মন বদলে যাবে...তোমার মনের জোর কম।" শিবি ফিসফিস স্বরে বলল, "বলো বদলাবে না, ভয়ে পিছিয়ে যাবে না?" রতনের একটা হাত তুলে নিয়ে আঙুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরল। "আমি খুব খারাপ মেয়ে, লেখাপড়া জানি না, কথাবার্তা খারাপ, দেখতে খারাপ। শরীর ছাড়া আর আর কিছু নেই...সবাই ওটাই চায়। আমার মন বলছে তুমি আমায় সত্যিকারের ভালবাসো।"

"তোমার মন ঠিকই বলেছে।"

শিবির চোখ জ্বলে উঠল। "তা হলে এখুনি আমাদের বিয়ে হবে।" বলেই সে তালি দিয়ে ঘর থেকে বাইরে ছুটে বেরিয়ে দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। শিকল তোলার আওয়াজ পেল রতন। এখুনি বিয়ে হবে, মানে? রতনের খটকা লাগল। ঘাড় জ্বালা করছে, শিবি পৈতেটা খুব জোরেই টেনেছিল। বাড়ি ফেরার সময় গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার থেকে পৈতে কিনে নিতে হবে। মেঝেয় বোতাম খুঁজল। ঝিনুকের বোতাম একটা ভেঙে গেছে, অন্যটা খুঁজে পেল না। সে জানলায় এসে দাঁড়াল। কানাগলিতে লোক চলাচল হয় না তবে তিনটে বাচ্চা মেয়ে এক্কা-দোক্কা খেলছে। রতন জানলা বন্ধ করে দিল। শিবির খোঁজ করতে এসে কেউ যদি জানলায় উঁকি মারে? অন্ধকার ঘরে সে বিছানায় শুয়ে কপালে হাত রেখে ভাবতে শুরু করল, শিবি বিয়ের কথা বলে ছুটে গেল কোথায়? ফাঁকা একটা পরের বাড়িতে এভাবে ঘরে বন্দি হয়ে থাকা ভাল দেখায় না। শিবির মা যদি এখন এসে পড়ে? বাইরে সদর দরজা তো খোলা রয়েছে।

ঘরের ভিতর রোদ আসে না। রতন তোষক থেকে ভ্যাপসা গন্ধ পাচ্ছে, বালিশে নারকোল তেলের গন্ধ। শিবি অমন করে ছুটে বেরোল কেন, সেই চিন্তা করতে করতে সে সিদ্ধান্ত নিল, ওকে এবার কড়া কথা বলতে হবে। খুবই বাড়াবাড়ি করল পৈতে ছিঁড়ে দিয়ে। হঠাৎ মাথার মধ্যে কী যে হয়ে গেল, লোকে বলে ঠাণ্ডা চাপা স্বভাবের অথচ নিজেকে সে ধরে রাখত পারল না! হুট করে বিয়ে করব বলার আগে সাতপাঁচ ভেবে দেখা উচিত ছিল। সামাজিক দিক দিয়ে, শিক্ষাদীক্ষায় শিবি কি তার যোগ্য? ওর মধ্যে সে কী এমন দেখতে পেয়েছে যে জন্য ওকে সারা জীবনের সঙ্গিনী করতে সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে? তা ছাড়া কাকা বা মা যদি শোনে? ভাবা যায় না কী ঘটবে!

চিন্তার ভারে রতনের মাথা ক্লান্ত হতে লাগল। জল তেষ্টা পেয়েছে। ঘরে কোথাও জল পাওয়া যাবে কি না, সেটা খুঁজে দেখতে হবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে তার ইচ্ছা করছে না। কোথাও থেকে কোনও শব্দ আসছে না। ঘরটা তাকে অসাড় করে দিচ্ছে। তন্দ্রা নামছে চোখে। কতক্ষণ কেটে গেল! ঘণ্টা দুই, দেড়, এক কি হবে? সে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ তার মনে হল ঘরের বাইরে যেন গলার আওয়াজ শুনল। উঠে বসার আগেই শিকল খুলে শিবি ঘরে ঢুকল। তার পিছনে মঙ্গলা আর জংলাছাপের হাওয়াই শার্ট, ফুলপ্যান্ট পরা একটি বলিষ্ঠ যুবক।

"ব্যবস্থা হয়ে গেছে, চলো শিগ্গিরি। মংলাদের পাড়ায় বটতলা-শিবের মন্দিরেই বিয়ে হবে। মোনা পুরুতমশাইকে বলে এসেছে। শালগ্রাম সাক্ষী রেখে মালাবদল আর সিঁদুর পরিয়ে দেবে।" শিবি উত্তেজনায় ফুটছে। তার চোখ দুটো আরও গোল হয়ে জ্বলজ্বল করছে। কথাগুলো বলল এক নিঃশ্বাসে।

"পুরুত বলল আগুনের ব্যাওস্তা ও করে দেবে একস্ট্রা পাঁচ টাকা লাগবে। আমি বলে দিয়েছি করুন, অগ্নিসাক্ষী থাকলে বিয়েটা আরও পাকা হবে।"

রতনকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে মোনা এবার তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল। "আরে ব্রাদার, বিয়ে তো একটা ছোট্ট ব্যাপার অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? চলো চলো।"

রতনের বাহু ধরে মোনা টেনেই তাকে ঘর থেকে বার করল।

"তোরা যা আমি কাপড়টা বদলেই যাচ্ছি।" শিবি বলল, "মোনা ওকে ধরে থাকিস।"

"না, ...না।" রতন হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে পারল না। মোনার গায়ের জোর তার প্রায় দ্বিগুণ। "এভাবে বিয়ে করব না। ...ছেড়ে দাও আমাকে।"

"ঠিক আছে ব্রাদার, শিবির সিঁথেয় সিঁদুরটা তো আগে লাগিয়ে দাও তারপর যেভাবে তোমার ইচ্ছে সেইভাবেই বিয়ে কোরো। মেয়েটাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে এখন পালাবার ফিকির করো না।"

রতনের বাহুতে মোনার মুঠো শক্ত করে চেপে বসল,

"ফাঁসিয়ে দিয়ে মানে !...ব্যাপারটা কী ?" রতন দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে তার হাঁটু কেঁপে উঠল, এ কী কথা !

"ফাঁসানো মানে জানো না ? মুখ দিয়ে খারাপ কথা বার করাবে ? দুপুরে, একটা মেয়ে ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই...চলো চলো।"

এরপর রতনের শরীর ছাড়া আর সব কিছু থেকে কাজ করার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল। সে শুনছে, দেখছে, তার হাতে ব্যথা লাগছে কিন্তু কিছুই তার মস্তিষ্কে কম্পন তুলে আসল জায়গায় আঘাত করছে না। সিনেমা স্লাইডের ছবির মতো মাথা থেকে সরে সরে যাচ্ছে দৃশ্য। গোঙানির মতো একটা শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে গলার কাছে। ঢোঁক গিলে সেটাকে নামানো যাচ্ছে না। তার পা দুটো তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু হাঁটতে তার সায় নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ কিন্তু দেখার কোনও কৌতূহল নেই। সে বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই।

রাস্তার আলো জ্বলে গেছে। সন্ধ্যার মুখে লোক চলাচল বাড়ে। কেউ ওদের লক্ষ করল না। মিনিট দুয়েক হেঁটে, পাথরের টালি বসানো একটা গলিতে মোনা তাকে ঢোকাল। দু ধারে খোলার চাল দেওয়া মাটির ঘর। এটা বুড়ো বট গাছ। তার তলায় ইটের একটা পাকা ঘর। দরজার উপরে টিমটিমে একটা বাল্ব। সামনে ছোট একটা সিমেন্টের চাতাল। ঘরটাই মন্দির, তার মধ্যে সিঁদুর মাখানো আধ হাত একটা কালো পাথর সিমেন্টে পোঁতা। পিছনে একটা ত্রিশূল। রতন দেখল খালি গায়ে ধুতি পরা এক বৃদ্ধ পুরোহিতের শাদা দাড়ি, লম্বা চুল, মোটা পৈতে, কপালে সিঁদুর। চাতাল ঘিরে মলিন বসন পরা কিছু স্ত্রীলোক, শিশু, কিশোরী। ওরা বিয়ে দেখতে ভিড় করেছে। রতন শুনল, "ছেঁড়া ময়লা জামা পরে বিয়ে কত্তে এয়েচে, কেমন বর গো !" "হোক

ছেঁড়া ময়লা, বরের মুখটা খুব মিষ্টি।" রতন দেখল, চৌকো বাক্সের মতো পিতলের সিংহাসনে বসানো শালগ্রাম শিলা ; এক জোড়া মোটা গোড়ের মালা ; বেলপাতা আর বাসি ফুল চাপানো একটা পিতলের ঘট ; পিলসুজে বসানো প্রদীপ। ঘটের দু ধারে চাতালে শিবির মুখোমুখি মোনা তাকে বসাল। শিবির পরনে লাল ফুলের ছাপ দেওয়া পুরনো সিনথেটিক শাড়ি। মুখে চকচক করছে ঘাম। দ্রুত চিরুনি চালানো চুলে আলগা খোঁপা। সে সোজা রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে, ব্রীড়ার কোনও আভাস তার ভঙ্গিতে নেই। রতন মুখ নামিয়ে রাখল।

মোনার তাড়ায় দশ মিনিটও লাগল না বিয়ে চুকে যেতে। ঘটের উপর রতনের হাতের উপর শিবির হাত, পুরোহিত সম্ভবত সংস্কৃতেই মন্ত্র পড়ল, তিন-চারটে শুকনো কুশের আঁটি জ্বালানো হল, ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল বটতলা। কাক ডেকে উঠল, ভিড়ের থেকে কাশির শব্দ উঠল আর তারই মধ্যে বসা অবস্থাতেই মালা বদল করল দুজনে।

"সিঁদুর সিঁদুর,...সিঁদুর পরাবে না ?" ভিড়ের মধ্য থেকে কে ব্যস্ত স্বরে বলে উঠল।

কাঁখালে মেয়ে সামলাতে সামলাতে মঙ্গলা কাঠের সিঁদুর কৌটো খুলে রতনের সামনে ধরে বলল, "বোয়ের সিঁথেয় মাখিয়ে দাও। এটাই হল আসল বিয়ে...তোমাকে আমার ধম্মোপত্নী কোল্লুম, লাগাও, চওড়া করে লাগাও।" মঙ্গলা উলু দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্য থেকে তিন-চারজন উলু দিয়ে উঠল। বিয়ে হয়ে গেল!

শিবমন্দির ফাঁকা হয়ে যেতেই মোনা বলল, "কুড়িটা টাকা দে শিবি, আজকের সুবদিনে বিলিতি খাব।"

"টাকা ? হাত খালি করে চুড়ি দিয়েছি, আংটি দিয়েছি, বিক্রি করে কত টাকা পেয়েছিস হিসেব দে।"

"শিবি ওকে একটাও পয়সাও দিস না" কাতর স্বরে মঙ্গলা বলল, "মদ খেলেই ও আমায় ঠ্যাঙায়।"

"আমি না থাকলে তোর কি বিয়ে হোতো ?...ব্রাদার তো তোর পেট করে দিয়ে কেটে পড়ছিল, আমিই তো ধরে আনলুম।"

"কী বললি...কী বললি...আর একবার বল...তোর মাস্তানি ছুটিয়ে দোব যদি ওর নামে অমন নোংরা কথা বলবি।" দু হাতের দশটা আঙুল বাঁকিয়ে, সাদা দাঁতগুলো বার করে শিবি বলল। "তোরা শুধু পেটই দেখিস আর একটু ওপরে উঠে মনটাকে দেখতে পারিস না ?" শিবি হাত ধরল রতনের। আর একটি কথাও না বলে সে টেনে নিয়ে চলল তার সদ্য হওয়া স্বামীকে। গলি থেকে বেরিয়ে গোলাপ দত্ত লেনে পড়ে শিবি মাথার উপরে আঁচল তুলে ছিল। রতন সেই যে বলেছিল 'এভাবে বিয়ে করব না, ছেড়ে দাও আমাকে', তারপর থেকে একটি কথাও বলেনি। এখনও নির্বাক রয়েছে। শুধু গলা থেকে মালাটা খুলে

নিয়ে হাতে দলা পাকিয়ে রেখেছে।

ততক্ষণে কেউ কেউ জেনে গেছিল। তারা শিবির বর দেখার জন্য বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে। ছয়ের-বি গলির মুখে দাঁড়িয়েছিল বীণা। রতনকে দেখে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বহু বছর ওকে সে দেখেনি। তবু চিনতে পারল আর "ওম্মা, রতন না ?" বলে গালে হাত দিল।

"চেনো নাকি গো ?" সামনের বাড়ির দরজা থেকে এক প্রৌঢ়া বলল।

"চিনব না ! রতন তো ওনার কাছে পড়তে আসত।...ছেলেটা যে এভাবে গলায় দড়ি দেবে কে ভেবেছিল...ভদ্দরঘরের বামুনের ছেলে !"

শিবি সদর দরজায় তালাচাবি দিয়ে বেরিয়েছিল। দরজার সামনে শিবির মা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

"এতক্ষণ মরতে কোথায় গেছিলি ?" রাগে ঝাঁঝিয়ে উঠল শিবির মা।

"বিয়ে কত্তে গেছলুম...এই তোমার জামাই।" স্বাভাবিক গলা শিবির।

কথা সরল না শিবির মার মুখে। দুজনের মুখের দিকে বারবার তাকাতে লাগল। তখনই রতনের মাথার মধ্যে দমকলের ঘণ্টা বেজে উঠল। শিবির মায়ের চোখ ধিকধিক জ্বলছে। যে কোনও মুহূর্তে হুশ করে একটা কেলেঙ্কারি জ্বলে উঠবে।

"হঠাৎ করে হয়ে গেল।...বটতলা শিবমন্দিরে মন্তর পড়ে—।"

শিবির কথা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। তার মা মুঠোয় চুল ধরে মাথাটা টেনে নামিয়ে চিৎকার করে উঠল, "পোড়ারমুখী, হঠাৎ করে ?...এ ভাবে নিজের সব্বোনাশ করলি !"

এই সময়ই দলা পাকানো মালাটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে রতন পিছন ফিরে প্রায় ছুটেই গোলাপ দত্ত লেনে পৌঁছল। তারপর হনহন করে হেঁটে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে এল। রাস্তায় গাড়ির স্রোত, পার হতে না পেরে সে অপেক্ষায় রইল। তার মাথায় সাড় ফিরে এসেছে। এখন সে ভাবতে পারবে, তাকে এখন ভাবতে হবে। অবিশ্বাস্য একটা কাজ সে করে ফেলেছে !

ভাবার জন্য, ট্রাম লাইন পেরিয়ে মিনিট দুয়েক হেঁটে সে চিলড্রেন্স পার্কে এসে বেঞ্চে জায়গা না পেয়ে ঘাসের উপর বসল। অনেক লোকই বসে আছে কিন্তু তার মতো একা কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। তরুণ পাঠাগারে বই নিতে আসত একটা লোক তাকে সে চিনতে পারল, সঙ্গে দুটি বাচ্চা। ঘাসে বসে চিনেবাদাম ভেঙে বাচ্চা দুটিকে খাওয়াচ্ছে। লোকটা কি এখনও বই পাল্টাতে যায় ? দিন দশেক সে নিজে চৈতন্য লাইব্রেরিতে যায়নি, কাল যেতে হবে। কাল সে বর্ধন প্রেসেও যাবে। পায়ে এখন আর কোনও ব্যথা নেই।...শিবি এ কী করল ! এখন আমি কী করব ? কী ভাবব আমি এখন ! সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

রতন বাড়ি ফেরার জন্য উঠে পড়ল। ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়বে, অবসন্ন পা, মাথায় দুশ্চিন্তা। ওরা শুনলে কী প্রতিক্রিয়া হবে ? বাড়ির দরজা

খোলা ছিল। চোরের মতো সে ঢুকল। মা রান্নাঘরে রয়েছে। দোতলায় কিছু একটা নিয়ে ননদ আর বউদিতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। শোবার ঘরে ঢুকেই রতন শার্টটা খুলে গেঞ্জি পরে নিল। কিছু একটা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য বহু বছর আগে তরুণ পাঠাগার থেকে আনা ছেঁড়া অভিধানটা খুলে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পাতা খুলতেই চোখে পড়ল : দিগর, দীগর—বিঃ (আদালতী ভাষায়) আদি, প্রভৃতি ; অঞ্চল... ।

"এতক্ষণ বাইরে কোথায় ছিলি দুপুর থেকে ?" উমা ঘরে ঢুকেছে।

হাত পা শক্ত হয়ে গেল রতনের। "এক বন্ধুর বাড়িতে।"

"পায়ে আর ব্যথা নেই ?"

"না।" বলেই অসহনীয় হয়ে ওঠা অপরাধবোধের তাড়নায়, গলাটাকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে, সে বলল, "আজ একটা ব্যাপার করে ফেলেছি মা।"

আড়চোখে সে দেখে নিল মায়ের মুখ। কৌতূহল আর শঙ্কা নিয়ে উমা তাকিয়ে রয়েছে। চোখ বন্ধ করে সে বলল, "বিয়ে করেছি।"

ঘরে শব্দ নেই। সে চোখ খুলল না। অনুমান করল অবিশ্বাস মায়ের মুখে ঘুঁষি মেরেছে। দুমড়ে গিয়ে ব্যথায় অসাড় হয়ে গেছে মুখ।

"কী বললি !" কোনওরকমে শব্দ দুটো বেরিয়ে এসেছে উমার মুখ থেকে।

"হঠাৎই ঘটে গেল, একেবারে আচমকা...ভাবতে আমার কী রকম যেন লাগছে।"

"কাকে বিয়ে করলি...সেই মেয়েটা ?"

রতন ধড়মড়িয়ে খাট থেকে নেমে উবু হয়ে বসে দু হাতে উমার পা চেপে ধরল। "মা আমাকে ক্ষমা করে দাও।...আমি জানি আমি অন্যায় করেছি, তোমরা এ বিয়ে মেনে নেবে না তাও জানি। তোমাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছি, আমি বংশের কুলাঙ্গার। কাউকে বলতে পারব না, শুধু তোমাকেই বললুম।"

"কীভাবে বিয়ে করলি, সই করে ?"

"না। শিবের মন্দিরে শালগ্রাম সাক্ষী রেখে, মালাবদল করে সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে...পুরুত মন্তর পড়েছে, অনেক লোকজন দেখেছে। এ বিয়ে অস্বীকার করব কী করে।"

মুখে হাত চাপা দিয়ে উমা থরথর কেঁপে উঠল, এবার চোখ দিয়ে জল নামবে। রতন ভয় পেল, মা অজ্ঞান হয়ে না যায় !

"এ তুই কী করলি রতু ? তুই যে এই বংশের একমাত্র ছেলে ! বংশটা নষ্ট হয়ে গেল।...কী বলে তুই অন্য জাতের অমন অসভ্য ইতর একটা মেয়েকে...ছি ছি ছি মুখে কি নোংরা অসভ্যের মতো কথাবার্তা...পারলি কী করে বিয়ে করতে ?...রতু তোর মতো এত ভদ্র ভাল ছেলে, সবাই কত প্রশংসা করে, তুই আমাদের সবার মুখে চুনকালি দিলি ! কী অপরাধ করেছি তোর কাছে ?"

উমার স্বর কাতর থেকে আরও কাতর হয়ে কান্নায় মিশে গেল।

মাথাটা মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে রতন কপালটা ঘষতে শুরু করল।

"আমাকে আর ছুঁসনি তুই।" উমা দু পা পিছিয়ে গেল। "তোর মুখ দেখতে ঘেন্না হচ্ছে।"

"দেখতে হবে না, এ মুখ সত্যিই আমি দেখাতে পারব না।...আমি চলে যাব। এ সংসারে থেকে তোমাদের লজ্জা দোব না।"

"তোর কাকা শুনলে আত্মহত্যা করবে...আমারই গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে।...রতু এ তুই কী করলি রে!"

"কাকাকে কিছু বোলো না, অন্তত যতদিন আমি এ বাড়িতে আছি।...তোমার আশীর্বাদ চাই না মা, আমাকে যত পারো অভিশাপ দাও।" বাচ্চা ছেলের মতো রতন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।..."চলে যাব আমি...কর্মফল আমি একাই ভোগ করব। কপালে যা আছে তাই হবে।" রতন জানালায় গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়াল। লন্ড্রিতে কাচানো জামাকাপড় নিয়ে বিষ্ণু ফিরছে। সে একবার জানলায় দাঁড়ানো রতনের দিকে শুধু তাকাল সামনের বাড়ির ছোটুদা দরজার কড়া নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। রতনকে দেখে বলল, "ভাল?" অস্ফুটে সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

আট

গ্রে স্ট্রিট আর নব মিত্র লেনের মোড়ে শিবি দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা থেকে। এইখান দিয়ে রতন বাড়ি ফিরবে অনুমান করে সে অপেক্ষা করছে। রতনকে আসতে দেখে সে এগিয়ে গেল। রতন তাকে দূর থেকেই দেখতে পেয়েছে। বুকটা একবার ছ্যাঁত করে উঠল। শিবি তাকে ছাড়বে না। স্ত্রীর অধিকার যদি চেয়ে বসে। যদি বলে শ্বশুরঘর করব?

"এখানে দাঁড়িয়ে যে, আমার জন্য?" চাপা গলায় বলল রতন। ফুটপাথ দিয়ে লোক চলাচল করছে প্রায় গা ঘেঁষে। তার মধ্যে পাড়ার লোকও থাকতে পারে, দেখলে কী ভাববে! তাদের মধ্যে কী ধরনের কথাবার্তা হবে, তা সে আন্দাজ করতে পারছে। দাঁড়িয়ে না থেকে রতন মন্থরভাবে হাঁটতে শুরু করল, তার পাশাপাশি শিবিও। ওর সিঁথিতে ক্ষীণ সিঁদুরের রেখা সে দেখে নিয়েছে।

"বলো, কী বলবে?" রতনের উদাস কণ্ঠে অনিচ্ছার আভাস।

"মা বলেছে আর থাকতে দেবে না, কী করব?"

"বিয়ে করার আগে সেটা ভেবে দেখেনি কেন? কিভাবে কাল বিয়ে বিয়ে খেলাটা হল! এটা কি বিয়ে?"

"বিয়ে নয়?" শিবির স্বরে বিমূঢ়তা! অবাক চোখে সে রতনের মুখ দেখার চেষ্টা করল। "শালগ্রাম ছিল, পুরুতমশাই মন্তর পড়ল, অগ্নিসাক্ষী রেখে মালাবদল হল, সিঁদুর পরিয়ে দিলে তুমি নিজের হাতে, আর বলছ বিয়ে নয়!

বস্তির কত বউ-মেয়েরা দাঁড়িয়ে দেখল পর্যন্ত, আর বলছ এটা কি বিয়ে ?" শিবির গলা চড়ে উঠল।

রতন বিব্রত হয়ে দু পাশে তাকাল। কেউ যদি শুনে থাকে তা হলে একবার তাদের দিকে তাকাবেই। কেউ তাকায়নি। তবে এমন উঁচু গলায় শিবি যদি আবার কথা চালায় তা হলে তাকাবেই। রতন দাঁড়িয়ে পড়ল। "এখন আমি কী করতে পারি ?"

"তোমাদের বাড়িতে আমাকে নেবে না আমি জানি।" শিবি নিশ্চিত স্বরে বলল।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে তারা পৌঁছেছে। রাস্তা পার হয়ে এখন কোথায় যাবে ? দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"না, তোমাকে আমাদের সংসারে নেবে না।...কাল মাকে সব বলেছি আর বলেছি এর পর আমি বাড়িতে আর থাকব না।"

"ঘর ভাড়া নেবে ?" ব্যগ্র হয়ে শিবি বলল। "মোনাকে বলব ? ওর অনেক চেনাজানা আছে পাড়ায়।"

"না। এই তল্লাটে আমি আর থাকব না।" অস্বাভাবিক কঠিন শুধু স্বরই নয় রতনের মুখের পেশীও শক্ত হয়ে উঠল।

"সেই ভাল। আমিও তাই ভেবেছি।...চলো আমরা দুজনে দূরে কোথাও চলে যাই, যেভাবে রাখবে সেভাবেই আমি থাকব, তুমি যা রোজগার করে আনবে তাতেই সংসার চালাব, মনে শান্তি আর ভালবাসা থাকলে কোনও অভাবকেই আর—"

"থামো, বোকার মতো কথা বলার সময় এখন নয়। শান্তি, ভালবাসা যেন ছেলের হাতের মোয়া।" রতন তার স্বভাববিরুদ্ধ রূঢ় গলায় ধমকে উঠল।

শিবি থতমত হল। রতন যে এভাবে ধমকে কথা বলতে পারে সেটা তার ধারণার বাইরে ছিল। রাতারাতি বদলে গেছে রতন। ওর নরম শান্ত চোখ দুটো রুক্ষ দেখাচ্ছে, গলার স্বরে জ্বালা। শিবির বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠল ভয়।

"বাড়ি যাও, এভাবে রাস্তায় আমার সঙ্গে আর দেখা কোরো না।...আমার আত্মসম্মান বোধটা আছে...সেটা আমি কাল খুইয়েছি। ওটা আবার আমি ফিরে পেতে চাই।" দাঁতে দাঁত চেপে ধরায় রতনের মুখে হিংস্র ভাজ পড়ল।

"মা আমাকে বেরিয়ে যেতে বলেছে। আমি কোথায় যাব ?" অনুনয় জানাল শিবি। চোখ ছলছলে হয়ে উঠেছে। "মা আমার জন্য ছেলে জোগাড় করেছিল, মদের বার-এ কাজ করে। আমি রাজি হইনি। লোকটা দু নম্বরি, মুখ্যু, মুখে শুধু খারাপ কথা। তোমার ধারেকাছেও আসে না।... আমি রাজি হইনি।" শিবি দু হাতে রতনের হাত ধরল, দু চোখে জ্বলজ্বলে প্রত্যাশা। তার চোখ বলতে চায়, আমি কি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি ?

এটা কলকাতার একটা বড় রাস্তার মোড়। রতন ঝাঁকানি দিয়ে শিবির হাত

দুটো ফেলে দিল। সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েটা, কোথায় কেমন ব্যবহার করতে হয় জানে না। মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে রতন বলল, "রাজি হওনি ভাল কথা...এ বার বাড়ি যাও। আমার কপালে যা লেখা আছে তা হবেই। দোষ তোমায় দিচ্ছি না...আমিও তো এখন নিমিত্তের ভাগী।..."

শিবির মুখ চোখ বদলে গেল। অসহায় নিরাশ্রিত করুণাপ্রার্থীর মতো ভঙ্গিটা নিমেষে অন্তর্হিত হল। নাক কুঁচকে চোখ দুটো ছোট করে চাপা খরখরে গলায় বলল, "বিয়ে বিয়ে খেলায় খেলুড়ে হতে গেলে কেন ? কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছিল ? আমাদের বাড়িতে যেতে কেন ? শিবানি দত্তর বুক চোরের মতো তো দেখতে...আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ ?...ঢ্যামনাপনা যদি করো তা হলে আমি ছ্যাচ্ছাড়িয়ে তোমার বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব বলব।...সম্মান আমারও আছে।" শিবি এক পা এগিয়ে রতনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে দাঁতের খই ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "পনেরো দিনের মধ্যে ঘর জোগাড় করে আমাকে নিয়ে যাবে...ঝুপড়ি হোক, বস্তি হোক সব আমার কাছে রাজপাসাদ। মনে থাকে যেন তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে।"

কথাগুলো বলেই শিবি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে নেমে সোজা তাকিয়ে রাস্তা পার হবার জন্য হাঁটতে লাগল। একটা মোটর বাইক আর একটা ট্যাক্সি শব্দ করে ব্রেক কষে তার দু গজ দূরে থেমে পড়ল। ট্যাক্সি ড্রাইভার অশ্লীল গালাগাল দিল। দৃকপাত না করে শিবি হনহনিয়ে রাস্তা পার হল। স্তম্ভিত রতনের চোখ যতক্ষণ পারল তাকে অনুসরণ করল। সে অনুভব করতে শুরু করল, ওই কালো মেয়েটার রক্ত মাংস মেদমজ্জা চটকে, দলা পাকিয়ে তার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। শিবি তার শরীরে রক্ত চলাচলের বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। যখন তখন বদলে যায় এমন প্রকৃতির এই মেয়েটাকে সে কখনওই বোধহয় গুছিয়ে বুকের মধ্যে জড়ো করতে পারবে না।

চোরের মতো দেখতুম ? রতন পাথরের মূর্তির মতো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল। একটা রাগ তার পা থেকে কপাল পর্যন্ত দাউ দাউ করে উঠে গেল। একটা নিচু ঘরের, অশিক্ষিত, বাজে রুচির মেয়ে তাকে ধরে ফেলেছে। তার ভিতরের নীচ হীন প্রবৃত্তিটা শিবি দু আঙুলে চিমটের মতো ধরে বার করে এনে বোঝাতে চাইল সে একটা নোংরা লোক। কোন সাবালক পুরুষমানুষ না মেয়েদের বুকের দিকে তাকায় ? এটা কি হীন নোংরা ব্যাপার ? রতন ধন্দে পড়ে গেল। একটা জ্বালা তাকে জ্বালাতে লাগল, বোধহয় আমি দুশ্চরিত্র ! মা আর দিদিকে বয়সের একটা সময় পর্যন্ত তার সামনে শরীরের আব্রু নিয়ে মাথা ঘামাতে সে দেখেনি। সেও সচেতন ছিল না কিন্তু সেটা অল্পবয়সের কথা।

শিবিকে আমি ছাড়তে পারব না, সেই বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রতন সিদ্ধান্তে পৌঁছল। ওকে মা আর থাকতে দেবে না, তা হলে যাবে কোথায় ? তারই তো ওকে দেখার কথা। যেমন ভাবেই বিয়েটা হোক, সে তো শিবির স্বামীই। বেচারা, অসহায় ! ওর হুমকিতে ভয় পেয়ে নয়, সে অদ্ভুত একটা

মমতা শিবির জন্য বোধ করছে বলেই ঠিক করে ফেলল পনেরো দিনের আগেই তাকে ঘর জোগাড় করে ফেলতে হবে।

কিন্তু কীভাবে খুঁজে পাবে ঘর ? দালাল লাগিয়ে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু কোনও দালালকেই সে চেনে না। পাড়ায় আঠেরো নম্বর বাড়ির আধবুড়ো, লম্বাচুল, রোগা একটা লোক শুনেছে বাড়ির দালালি করে। লোকটাকে বলার চিন্তা সে সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলল। পাড়ার লোককে বললে জানাজানি হয়ে যাবে। নিজে খোঁজ করা যেতে পারে কিন্তু সময় কোথায় ! বর্ধন প্রেসের চেনাজানা লোকেদের অবশ্য বলা যেতে পারে। অমিয়কে তার মনে পড়ল। হালসিবাগানে ঘর ভাড়া করে ছেলে-বউ নিয়ে থাকে, করিতকর্মা মিশুকে লোক, তাকে ভালওবাসে। ওকে বললে নিশ্চয় একটা ঘরের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেলামি, অ্যাডভান্স ভাড়া না দিলে ঘর পাওয়া যাবে না। প্রেসের কাছেই আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্ট অফিসে হাজার চারেক টাকা জমিয়েছে, মা বা কাকা তা জানে না। খুব কম ভাড়ার ঘরের জন্য অমিয়দাকে সে বলবে।

পরদিন প্রেসে পৌঁছেই রতন লাইনো বিভাগে গেল। অমিয় তখন কাজে ব্যস্ত। মুখ তুলে একবার তাকাল শুধু।

"অমিয়দা একটা খুব দরকারি কথা ছিল। টিফিনে চায়ের দোকানে আসবে ?"

"যাব।"

সঞ্জিতবাবুর চায়ের দোকানে রতন আগেই গিয়ে কোণের টেবলে বসেছিল। অমিয় আসতেই সে হাত তুলে জানান দিল।

"কী দরকার বল।" অমিয় মুখোমুখি বসে বলল।

রতন তৈরিই ছিল। কিভাবে শুরু করবে মনে মনে এতক্ষণ সেটাই হাতড়ে গেছে। যেভাবে বিয়েটা হল তা শুনলে অমিয়দা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। মিথ্যা কথা তাকে বলতেই হবে। সেটাই সে সকাল থেকে বারবার বানাবার চেষ্টা করেছে। চায়ের দোকানে বসেও ভেবেছে বটতলার বিয়ের কথাটা তাকে চেপে যেতে হবে।

"অমিয়দা, সেদিন আমার সঙ্গে যে মেয়েটাকে দেখেছিলে—"

"তাকে বিয়ে করবি তো ?"

"হ্যাঁ...মানে করে ফেলেছি।"

অমিয় অবাক হয়ে রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"হঠাৎই, কাউকে বলার সময়ই পেলুম না।"

"কবে করলি ?"

"পরশু।"

"রেজিস্ট্রি করে ?"

"হ্যাঁ।" রতন হাঁফ ছাড়ল। রেজিস্ট্রির কথাটা একদমই তার মনে আসেনি। বটতলা আর রেজিস্ট্রিতে তফাতই বা কী ! পুরুত আর সাক্ষীরা তো

ছিলই।

"তা হঠাৎ রেজিস্ট্রি কেন, বাড়িতে গোলমাল ?"

"হ্যাঁ, অন্য জাত বলে বাড়িতে রাজি হয়নি, মেয়ের বাড়ির লোকেরা ওর অন্য জায়গায় বিয়ে প্রায় পাকা করে ফেলেছিল। তাই আর দেরি করলুম না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে শিবিকে এখন রাখব কোথায় ?...কম ভাড়ায় যা হোক একটা ঘর দেখে দাও না অমিয়দা। আমার অবস্থা তো জানো। রতন টেবলে রাখা অমিয়র হাত চেপে ধরল।"

"বাড়ি ছাড়বি ?...কিন্তু ঘর তো বলামাত্র পাওয়া যায় না। খোঁজ করতে হবে, লোকজনকে বলতে হবে।"

"তুমি একটু চেষ্টা করলেই হবে অমিয়দা, এখুনি না পেলে শিবি বড় বিপদে পড়ে যাবে। বিয়ের কথা এখনও কেউ জানে না। জানাজানি হয়ে গেলে কী যে হবে !"

"তোর বাজেট কত ?...সেইমতো খোঁজ নিতে হবে তো।"

"হাজার তিনেক।"

মুখ বাঁকাল অমিয়। "অত কম টাকায় সেলামিটেলামি দিয়ে ভাল জায়গায় কি ঘর পাওয়া যায় !"

"দরকার নেই ভাল জায়গার, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই এখুনি চাই। টিনের চাল, খোলার চাল যেমনই হোক।"

"আচ্ছা দেখি, জানিসই যখন বাড়িতে এ বিয়ে মেনে নেবে না তখন আগে থেকে বাসা ঠিক করিসনি কেন ? নতুন বউকে নিয়ে কোথায় আরাম করে থাকবি, তা নয় টিনের চাল খোলার চালের ঘরের কথা মুখে আনছিস। বউমা থাকতে পারবে ?"

"ও বলেছে ঝুপড়ি বস্তি সব ওর কাছে রাজপ্রাসাদ।"

"হুঁ।" অমিয় আবার মুখ বাঁকাল।

ছ দিন পর অমিয় চায়ের দোকানে রতনকে ডেকে পাঠাল।

"শোন, একটা ঘরের খবর পেয়েছি, পাশের পাড়া হরনাথ লেনে। রোববার সকালে আমার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করবি, সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বাড়িওলা দোতলাতেই থাকে, মুখোমুখি কথা বলে নিবি অবশ্য ঘর যদি পছন্দ হয়।"

"তুমি ঘর দেখেছ ?"

"না।"

"কত চেয়েছে ?"

"বলেনি কিছু। তবে একটা কথা আগেই বলে রাখি, ঘরটার বদনাম আছে।" অমিয় স্থির দৃষ্টিতে রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপ ঠোঁটের কাছে ধরে রেখে বলল,

"তুই ভূতে বিশ্বাস করিস ?"

রতন অবাক হয়ে বলল, "না। এ কথা বলছ কেন ?"

"ঘরটা আট মাস খালি পড়ে আছে, কেউ ভাড়া নিতে চায় না। যে লোকটা থাকত তার লিভারে ক্যানসার হয়, বৌ ছিল, আর একটা আলু পেঁয়াজের দোকান মানিকতলা বাজারে। ক্যানসার জানিস তো কর্কট রোগ, অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ট্রিটমেন্ট করাতে গিয়ে দোকানটা বেচে দেয়। একেবারে নিঃস্ব অবস্থায়, শেষকালে সহ্য করতে না পেরে লোকটা গলায় দড়ি দেয় রাতে রান্নার জায়গায়। ভোরে ঝুলন্ত বডি দেখে বউ লোকজন না ডেকে নিঃসাড়ে কোথায় যে চলে যায় কেউ আজ পর্যন্ত তার হদিশ করতে পারেনি।" কথাগুলো বলে অমিয় চা খাওয়ায় মন দিল। রতনের শুনতে খারাপ লাগছিল এইভাবে মারা যাওয়ার কথা শুনে।

"খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছে।" বিষাদ মাখানো স্বরে সে বলল,

"লোকটার শ্রাদ্ধশান্তি হয়নি, গয়ায় পিণ্ডি দেওয়াও হয়নি। পাড়ার লোক বলে ঘরে প্রেত আসে, মাঝেমাঝে দরজা খোলা আর বন্ধের আওয়াজ শোনা যায়। বউকে খুব ভালবাসত তাই নাকি খুঁজতে আসে। পাড়ার একটা লোক পরীক্ষা করতে এক রাত ঘরে কাটিয়ে ছিল, সে নাকি মাঝরাতে রান্নাঘরে কান্নার শব্দ শুনেছে। ...এবার বল, ঘরটা পেলে নিবি ?"

"নোব,...কলকাতার মতো শহরে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে ভূত ? গ্রামের শ্মশান-টশান কি পোড়োবাড়ি হলেও নয় কথা ছিল ! তুমিও কি এ সব বিশ্বাস করো অমিয়দা ?"

"আমার কথা বাদ দে ! কলকাতার থ্রি-ফোর্থ লোক গ্রাম থেকে এসেছে, তারা এ সব বিশ্বাস করে...কিন্তু বউমা থাকতে রাজি হবে তো ?"

"কেন রাজি হবে না ? আমি থাকতে পারলে সেও থাকতে পারবে।" রতনের মনে পড়ে গেল কথাগুলো : 'দূরে কোথাও চলে যাই, যেভাবে রাখবে সেভাবেই আমি থাকব'। ভূত থাকুক কি পেত্নিই থাকুক, এই ঘরটা পেলে সে নেবেই। মাথা গোঁজার একটা জায়গা তার এখন ভীষণ দরকার। শিবিকে ব্যাপারটা না বললেই হল, পরে যদি ওর কানে যায় তখন দেখা যাবে।

রবিবার পর্যন্ত সে টানটান হয়ে কাটাল। মা থমথমে মুখে ঘোরাফেরা করে, তার সামনে আসাটা এড়িয়ে যাচ্ছে। "খেতে আয়", "কখন বেরোবি", ধরনের কথা ছাড়া অন্য একটি কথাও বলেনি। কাকার আচরণ দেখে সে বুঝেছে মা ওকে কিছু বলেনি। ঘর পেলেই সে নিঃশব্দে চলে যাবে, এখানকার কোনও জিনিস সে সঙ্গে নিয়ে যাবে না। নেবার মতো অবশ্য কিছুই তার নেই। নতুন জিনিসপত্তর দিয়ে সে নতুনভাবে তার জীবন শুরু করবে, স্বাধীনভাবে। যদি ঘর পায় তাহলে শিবিকে খবর দিতে হবে।

অমিয়র বাড়ি রতন চেনে, দু-তিনবার গিয়েছে। অমিয়র বউ কমলাকে সে বউদি বলেছে। ঠাণ্ডা মৃদু স্বভাবের, তিন ছেলেমেয়ের মা। রবিবার নটা নাগাদ রতন হালসিবাগানে পৌঁছল বাড়ি থেকে হেঁটেই। ছোট বেলায় পরেশনাথের মন্দির দেখতে হেঁটেই এসেছে, সেই পাড়াতেই অমিয় থাকে।

"চা খাবি ?" অমিয় তখন খালি গায়ে লুঙ্গি পরে চা খাচ্ছিল।

"না, সকালে এক কাপের বেশি খাই না," রতন বলল।

"বাড়িওলা কাশিবাবুর সঙ্গে কাল কথা বলে রেখেছি। উনি রাস্তায় আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন।"

"রাস্তায় কেন ?"

"ঘরের খোঁজ করতে কেউ এলে রাস্তাতেই তাকে ধরে পাড়ার লোকে নাকি ভাংচি দেয়, ও ঘরে ভূত আছে। তাই উনি পাড়ার লোকের খপ্পরে পড়ার আগেই আমাদের আগলে রাখতে চান।"

"কিন্তু আমি তো ভূত আছে জেনেই যাচ্ছি !"

"সেটা তো পাড়ার লোকের কাছেই আমি শুনেছি, কাশিবাবু তো চেপে গেছেন।...আর শোন ভাড়া বলেছে সত্তর টাকা, এক বছরের অ্যাডভান্স, সেলামি চায়নি। আমি বলেছি আগে ঘর দেখি তারপর যা বলার বলব। তুই তড়বড়িয়ে কিছু বলতে যাবি না। চল এবার।" অমিয় দড়িতে ঝোলানো পাঞ্জাবিটা টেনে নিল। কাশিনাথ ঘোষ বাড়ির সামনে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে। সদর দরজার পাশে সরু আড়াই হাত চওড়া মাটির গলি, ঠিক অনাথ স্যারের বাড়িতে ঢোকার গলিটার মতো। এটাই বাড়ির পিছন দিকে ভাড়াটের ঘরে যাবার পথ। সেই গলি দিয়ে কাশিনাথের পিছু নিয়ে তারা একটা তালাদেওয়া দরজায় এসে দাঁড়াল। দরজার দু ধারে বন্ধ দুটো জানালা।

তালা খুলে কাশিনাথ পাল্লা দুটোয় ধাক্কা দিল। ভিতরটা অন্ধকার, ওরা স্পষ্টভাবে কিছু ঠাওর করতে না পারলেও দেখতে পেল একটা খাট আর দেয়ালে টাঙানো রাধাকৃষ্ণর ছবি। কাশিনাথ ভিতরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। কম পাওয়ারের বাল্‌ব। ভ্যাপসা গন্ধ একটু কমল জানলা দুটো খুলে দেওয়ায়। ঘরে রোদ ঢোকে না। খাটে গদি বা তোষক নেই।

"বুঝলেন, পুরো সংসারটাই ফেলে রেখে বউটা চলে যায়। জিনিসপত্তর যাই ছিল, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, বিছানা বালিশ আরও সব ছাতামাতা লোক ডেকে এনে বলি, সব নিয়ে যা। কী হবে ওসবে আমার ! খাটটাকে বিদেয় করিনি, ভাড়া এক বছরের বাকি রয়েছে, এটা বিক্রি করে যদি দুমাসেরও ভাড়া ওঠে !"

অমিয় আর রতন দেখে নিল, ঘরের লাগোয়া রান্না ঘরটা অর্থাৎ একদিক খোলা একটা তক্তপোশ রাখার মতো জায়গা। রান্নার জায়গার পাশের দরজাটা দিয়ে বেরোলেই উঠোন আর এজমালি কল-পায়খানা। অমিয় এক চোখ টিপে ইশারায় রতনকে জানিয়ে দিল, নেওয়া যেতে পারে।

"কাশিবাবু ঘরটার কী যেন একটা বদনাম আছে শুনেছি।" অমিয় এবার আসল কথায় এল। সে আগে ভেবে রেখেছে ভাড়া কমাতে ভূতের সাহায্য নেবে।

"ও হো হো, আপনাদের কানেও ভূত ঢুকেছে ?" কাশিনাথের মুখচোখ

তেতোঃ গোলার মতো হয়ে গেল। এ পাশের বাড়ির মলয় ধরের বদমাইশি, এই বাড়িটা কেনার জন্য দেড় বছর ধরে আমাকে টোপ দিচ্ছে। আমি বলেছি, না, আর যাকেই বেচি ওকে বেচব না। আরে মশাই আমার কি পয়সার অভাব! একটা মাত্র মেয়ে, বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, আছি তো শুধু কর্তাগিন্নি। গিন্নির বাত, একতলায় সিঁড়ি ভেঙে নাবতে পারে না। দু দিন বাদে মরে যাব, পয়সা কি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে ?...এই বাড়ি আমি দান করে দিয়ে যাব...ইনুভার্সিটিকে, মেডিকেল কলেজকে, ভারত সেবাশ্রমকে, তবু বেচব না, অন্তত ওই নতুন পয়সাওলাটাকে নয়।" কাশিনাথের উত্তেজিত স্বর চিৎকারে পৌঁছল। "কত রটাবে রটাক, আমি পরোয়া করি না, ঘর যদি খালি পড়ে থাকে তো থাকুক তাতে কাশি ঘোষ না খেয়ে মরবে না।"

"কিন্তু ভাড়াটে না পেলে তো মলয় ধরই নিতে যাবে, দানটান ছাড়ুন, বাড়ি তো মেয়েই পাবে। এই রতনই প্রমাণ করে দেবে ভূতটুত সব বাজে কথা। ভাড়াটা একটু কমান, পঞ্চাশ করুন আর অ্যাডভান্সটা ছ মাসের।...দাদা রাজি হয়ে যান। মলয় ধরের বদমাইসিটা লোক টের পেয়ে যাবে ভাড়াটে বসলে। আর খাটটা বিক্রি করবেন কেন, আপনার কি টাকার অভাব ? ওটা বরং রতনকে প্রেজেন্ট করে দিন।" অমিয় তার বলার ভঙ্গিতে দিলদরিয়া ভাব ফোটাল। কাশি ঘোষের দুর্বলতা যে কোথায় সেটা সে ধরে ফেলেছে। রতন যতই শুনছিল অমিয়র কথা ততই অবাক হচ্ছিল। মনে মনে সে স্বীকার করল, অমিয়দা না থাকলে সে কাশি ঘোষের সব দাবিই একবাক্যে মেনে নিত।

"প্রেজেন্ট ফেজেন্ট করতে পারব না, একশো টাকা দিতে হবে,...কবে আসবেন ? অ্যাডভান্স কবে দেবেন ?...মাসের সাত তারিখের মধ্যে ভাড়া চাই, বিলও আমি দোব।" কাশি ঘোষের উত্তেজনার বাষ্প উবে গিয়ে অমিয়র কথাগুলো মাথায় জমাট বেঁধেছে।

"কালই পোস্টাপিস থেকে টাকা তুলে সন্ধে বেলায় দিয়ে যাব।" রতন ধড়মড় করে ঘুম থেকে ওঠার মতো ব্যস্ত হয়ে বলল।

"আজ আষাড়ের উনত্রিশ, পয়লা শ্রাবণ থেকে তাহলে ভাড়া শুরু হবে... থাকবেন দুজন তো ?"

"এখন দুজন , পরে তিনজন হবে, তারপর চারজন হবে।" অমিয় চোখ টিপল, নরম ধমকে রতনের চোখ ভুরু কুঁচকে উঠল। অমিয়দা ঠোঁটকাটা তাই বলে বাইরের লোকের সামনে !

ফেরার সময় হাঁটতে হাঁটতে অমিয় তাকে বলে দিল সংসার করতে হলে কী কী জিনিস তাকে এখুনি কিনতে হবে। রতনের মাথার সব দরজা জানলা তখন একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, অমিয়র কথাগুলো ঢোকার পথ পেল না। তখন চোরাবালিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো তার মনের অবস্থা। একটা কথাই বার বার তাকে হতাশার মধ্যে নামিয়ে দিচ্ছিল... তা হলে সত্যি সত্যিই এ বার সংসার থেকে বেরিয়ে আসছি ! এবার একা তাকে চলতে হবে। এতকাল কাকা

আর মা-র আড়ালে থেকে জীবন কেটেছে, বিপদে আপদে সে জানত, ওরা আছে। এবার আর ওরা থাকবে না। একটা ভয় তার বন্ধ মাথার মধ্যে ইঁদুরের মতো ছোটাছুটি শুরু করল। সে জানে এই ভয় শিবি কাটিয়ে দিতে পারবে না। সেদিন দুর্বল হয়ে বটতলার বিয়েটা না করলে আজ সে এমন অবস্থায় পড়ত না। নিজের উপর রাগ করে এখন অর আগের নিশ্চিন্ত জীবনে ফেরা যাবে না। সান্ত্বনার মতো সে নিজেকে শোনাতে লাগল, জীবন কি কখনও চিরকাল একরকম থাকে ? কতরকম ভাবেই তো বদলায় ! এটাও ধরে নেওয়া যাক একটা বদল। যা ঘটে গেছে, যাকে সে বদলাতে পারবে না তার সঙ্গে আপোস করে চলতে পারলে বোধহয় ঝঞ্ঝাটমুক্ত জীবন পাওয়া যেতে পারে। ঝঞ্ঝাটকে সে বরাবরই এড়িয়ে চলেছে। সে শান্তি ভালবাসে।

"অমিয়দা এখন আমি বাড়ি যাই।" রতন সার্কুলার রোডে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"এবার তোর প্রেসে যাওয়ার রাস্তাটা আগের থেকে কম হবে, সুবিধেই হল।"

"তুমি যে উপকার করলে তা আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। অমিয়দা কি যে দুশ্চিন্তা ছিল !" রতন ঝুঁকে (অপ্রস্তুত) অমিয়র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। "ঠিক আছে ঠিক আছে।" অমিয়র চোখে আবেগ ও স্নেহ ফুটে উঠল। কাঁধ চাপড়ে বলল, "বাড়ির আপত্তি সত্ত্বেও অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করেছিস, মরদের মতো কাজ করেছিস। জাত গোত্তর মিলিয়ে বিয়ে করে শিক্ষিতরা যাদের কলজেতে ক্যানসার...যা যা বললুম বউমাকে সঙ্গে করে সেগুলো বাজার থেকে কিনে নিবি।"

"নোব। আগে বাল্‌ব কিনতে হবে, অত কম আলোয় বই পড়া যাবে না।" ট্রাম রাস্তা পার হয়ে রতন সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ধরে পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করল। শিবিকে আজই খবর দিতে হবে। উত্তেজনায় তার শরীর চনমন করে উঠছে। পনেরো দিনের আগেই ঘর জোগাড় করেছে, এটা কি ওকে বুঝিয়ে দেবে না রতন রায় একটা মেনিমুখো ছেলে নয় ! অমিয়দা বলল, মরদের মতো কাজ সে করেছে। রতনের হাঁটার বেগ বেড়ে গেল। এখুনি সে শিবিকে জানিয়ে দেবে।

সদর দরজা খুলল শিবির মা, চোখ কুঁচকে গেল রতনকে দেখেই। "কী চাই ?"

"শিবিকে।"

"তোমার বউকে ? ও তোমার বউ নয়, মন্দিরে মালাবদল করলেই সেটা বিয়ে হয় না। ...কাটো এখান থেকে, শিবির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, সত্যচরণের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে।" বলেই শিবির মা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। শব্দ করে খিল পড়ল।

হতভম্ব হয়ে রতন দাঁড়িয়ে রইল। শিবির আবার বিয়ে হবে ! সে ছুটে

জানালায় গিয়ে ডাকল, "শিবি, শিবি।"

জানলায় এসে দাঁড়াল বিস্মিত শিবির মুখ। "কী ব্যাপার!"

"ঘর পেয়েছি, শিবি ঘর পেয়েছি।" ফিসফিস করে রতন বলল উত্তেজনা দমন করে। সরে গেল মুখটা। কয়েক সেকেন্ড পর সদর দরজার খিল খোলার শব্দ হল।

"শিবি কালই অ্যাডভান্স করব ছ'মাসের ভাড়া, এখুনি কথা হয়ে গেছে বাড়িওলার সঙ্গে।"

মায়ের সামনেই শিবি দু হাতে জড়িয়ে ধরল রতনের হাত। "সত্যি!...কোথায় পেয়েছ, কবে যাব?" রতনকে সে টেনে বাড়ির মধ্যে ঢোকাল। মায়ের দিকে তাকিয়ে শিবি বলল, "মন্দিরে বিয়ে করলে সেটা বিয়ে নয়?...ওসব অন্যকে বুঝিয়ো শিবিকে নয়। বাড়ি থেকে আমাকে তো বেরিয়ে যেতে বলেছ, এবার তাই যাব।...বলো কবে যাব?" প্রশ্নটা রতনকে।

"আগে সংসারের জিনিসপত্তর কেনা হোক, তারপর তো।" রতন কথাটা বলে শিবির মায়ের দিকে তাকাল। ওর সামনে সব কথা বলা ঠিক হবে না ভেবে নিয়ে সে শিবির হাত ধরে তাকে বাড়ি থেকে টেনে বার করল। সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে সে গলা নামিয়ে তড়বড় করে বলল, "অ্যাডভান্স পেলে বাড়িওলা ঘরের চাবি দেবে। তারপর যা যা কেনার কিনতে হবে। কাল সন্ধে বেলায়, সাতটা থেকে আটটা, হ্যাপি গ্রিলের সামনে থেকো। তোমার মার সামনে এ সব কথা বললুম না, তা হলে কী বাগড়া দেবে, কে জানে...তোমার বিয়ে নাকি ঠিক করে ফেলেছে?" রতনের চোখে মুখে ফুটে উঠল উৎকণ্ঠা।

"আরে রাখো তো ওসব ফালতু কথা। কোথাকার কোন মুখ্য, মোদো মাতাল...বললেই আমি বিয়ে করব? তাহলে কাল সাতটা-আটটায়? জিনিসপত্তর যা কেনার আমিই কিনব তুমি শুধু টাকাটা দিয়ো।"

"দোব, এখন চলি।" রতন ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। শিবি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে, ভিজে বাতাস লাগানোর মতো আরাম ওর মুখে। চোখ দুটো আধবোজা। পটে আঁকা ছবির মতো নরম ভঙ্গিতে শরীরটাকে আলতো করে দাঁড়িয়ে। মুখে একটা পাতলা হাসি যার একশো রকমের মানে করা যায়। অন্তরের অন্তঃস্থলে গভীর তৃপ্তি রতন বোধ করল। অতীতের জীবন থেকে নিজেকে...ছিঁড়ে ফেলার জন্য তার কোনও খেদ আর রইল না। কয়েক মুহূর্তের জন্য এমন একটা ছবি উপহার পেয়ে সে কৃতজ্ঞবোধ করল শিবির কাছে। এখন পৃথিবীর বলিষ্ঠতম লোক বলে নিজেকে তার মনে হচ্ছে।

"আমি কিন্তু পনেরো দিনের আগেই—" কথা শেষ না করেই রতন বাড়ির দিকে দপদপিয়ে রওনা দিল। সে এখন খুব সুখী। একটা হৃদয় সে জয় করেছে।

পরের দিন পোস্ট অফিস থেকে সে এক হাজার টাকা তুলল। কাজ থেকে

ফেরার পথে কাশিনাথ ঘোষকে সে অ্যাডভান্সের তিনশো আর খাটের জন্য একশো টাকা দিয়ে ঘরের চাবি নিল। হ্যাপি গ্রিলের সামনে সে পৌঁছল সাতটায়।

বাসস্টপে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে শিবি দাঁড়িয়েছিল বিয়ের সময়ের খয়েরি সিন্থেটিক শাড়িটা পরে। এইটাই ওর সেরা শাড়ি। কপালে সিঁদুরের টিপ, নাকের উপর সিঁদুর গুঁড়ো। সিঁথেয় চওড়া করে টানা সিঁদুর। হাতে শাঁখা আর লোহা। বিবাহিতা, এই ঘোষণা সদর্পে তার অঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে।

"এই যে চাবিটা।" রতন কোহিনুর হিরে হাতে তুলে দেওয়ার মতো চাবিটা শিবির দিকে এগিয়ে দিল। বিশ্বাস না করা চোখে ফুটে উঠল বিশ্বাস। শিবিকে সে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। "কালই তুমি চাবি খুলে ঘরে ঢুকতে পারো। তবে পরশু কলি করিয়ে দেবে, তার পরের দিনই যাব।"

"কোথায় ঘর পেয়েছ, কাছাকাছি ?"

"বড় পরেশনাথের মন্দিরের কাছে পাকা বাড়ি, একতলায় একটা ঘর, রান্নার জায়গা। বাড়িওলা কত্তা-গিন্নি ওপরে থাকে, বাড়িতে আর লোক নেই, নির্ঝঞ্ঝাট, আমাদের প্রেসের লাইনো অপারেটার অমিয়দাই ঠিক করে দিয়েছে, কাছাকাছিই থাকে, আমাকে খুব ভালবাসে। ওদের সদর আলাদা, আমাদের যাতায়াত গলি দিয়ে।" একটানা সে বলে গেল। শিবির মুখে উত্তেজনা দেখবে ভেবেছিল কিন্তু তার বদলে দেখল শান্ত নরম ছায়া। চাবিটা চোখের সামনে তুলে শিবি হাসল।

"কত ভাড়া ? পাড়াটা কেমন ?"

"সত্তর চেয়েছিল, অমিয়দা বলে কয়ে পঞ্চাশ করিয়েছে, শস্তা না ?"

"না দেখে এখনই বলব কী করে শস্তা কি না ! ঘরে রোদ হাওয়া আসে ? কলের জল পড়ে কেমন, সরু না মোটা ? কাপড় শুকো দেওয়ার জায়গা আছে ? ছাতে যেতে দেবে তো ?"

রতন দু হাত তুলল শিবিকে থামাবার জন্য। "ছাদে যেতে দেবে কি না এখনই আমি কী করে বলব...কত লোক তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যাচ্ছে তা জানো ?" রতন কথা ঘোরাবার জন্য বলল।

"দেখুক।" আড়চোখে দু ধারে তাকিয়ে আঁচল টেনে শিবি শরীর মুড়ে ফেলল, ঠোঁট মুচড়ে বলল, "দেখার জিনিস তো দেখবেই...শুধু একজনেরই দেখার চোখ নেই।" তার ঠোঁটের দু ধারে অভিমান জমে উঠল।

রতন জীবনে এই প্রথম স্বচ্ছ স্পষ্ট যৌন আহ্বান পেল। শুধু একজনেরই এই দুটো শব্দ তার ভীষণ ভাল লাগল। "জানো, একটা পুরনো খাট ছিল, ডবল বেড, একশো টাকায় কিনে নিয়েছি।"

হঠাৎ খাটের কথা কেন এই সময় তার মাথায় এল ! দেখার চোখ যে তার আছে বোধহয় সেটা বোঝাবার জন্যই একসঙ্গে শোয়ার ইঙ্গিত দিতে কি খাটের কথা তুলল। সে লজ্জা বোধ করল। চারধারে এত লোক চলাচল করছে আর

তারই মাঝে সে শিবিকে তার সঙ্গে শোয়ার একটা ইশারা দিয়ে ফেলল ? রতন অবাক তো হলই মনে মনে কুঁকড়ে গেল।

"একশো টাকা খরচ করার কী দরকার ছিল ? গোটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাল একটা তক্তাপোশ হয়ে যেত। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আর হবে কবে !"

"কোনওদিনই হবে না।" রতন হাসার চেষ্টা করল।

"আমাকে টাকা দাও, জিনিস-টিনিস আমিই কিনব। আগে উনুন কয়লা ঘুঁটে কেরোসিন, হাঁড়ি হাতা—"

"থাক, থাক, আর ফর্দ দিতে হবে না। আগে তোশক বালিশ চাদর চাই। ভাল করে শুতে না পারলে এত খাটাখাটুনি করে লাভ কী ?" রতন হাল্কা সুরে বলল।

"তুমি একটা কুঁড়ের বাদশা, বেশি বই পড়লে লোকে আলসে হয়।"

"কী করে জানলে ?"

"বাবা বলত।"

"এখন আমি লাইব্রেরি যাব বই পাল্টাতে। রাতে কিছুক্ষণ বইটই না পড়লে আমার ঘুম আসে না, অনেককালের অব্যেস। তুমি এখন দুশো টাকা রাখো, ঘরটা কলি হলেই জিনিসপত্তর কিনে গৃহপ্রবেশ করে ফেলব।" রতন পকেট থেকে একগোছা নোট বার করল।

"রাতে আলো জ্বেলে বই পড়বে ? ও সব চলবে না, আলো জ্বললে আমি ঘুমোতে পারি না।...বইটই দিনের বেলা পড়ো।" শিবির মুখে অসন্তোষ ফুটল।

"এই দেখো ! ঘর করা শুরু না হতেই ঝগড়া শুরু করে দিলে ? তোমাকেও বই পড়ার নেশা ধরিয়ে দেব।"

শিবি ঠোঁট ওল্টাল। "দেখব, কেমন তুমি ধরাতে পারো।"

রতন টাকা গুনে শিবির হাতে দিল। জিভে থুথু লাগিয়ে শিবি আবার গুনল। "আমি মানিকতলা বাজার থেকে দুপুরে সব কিনে সোজা চলে যাব। তুমি কোথায় থাকবে ? ওদিন আপিসে ছুটি নাও। ঘরদোর ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে...ওহ্ ঝ্যাঁটা কেনার কথা মনে পড়েনি। রান্না করার টাইম তো সে দিন পাব না, কচুরি খেয়ে রাত কাটাতে হবে। পাড়ায় কয়লার দোকানটা দেখে রাখোনি ?"

"এখন তুমি বাড়ি যাও। দুপুর দুটোর সময় মানিকতলা বাজারের পূব দিকের গেটের সামনে থাকব। কেনাকাটা করে রিকশায় মাল চাপিয়ে ঘরে যাব। একদম নতুন জিনিসপত্তর দিয়ে নতুন জীবন শুরু করব।" রতনের গলায় উদ্দীপনা ফুটল।

"সব আর নতুন কোথায়, খাটটা তো পুরনো !"

রতন ঢোঁক গিলল। শুধু পুরনোই নয়, ওই খাটে শুয়েছে ক্যানসারের রুগি। লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, সে কথা শিবিকে বলা হয়নি। ঘরে

ভূত আছে এই রটনার কথাও সে চেপে গেছে। রতন বুকের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করল।

"খাটটা পালিস করিয়ে নিলেই নতুন হয়ে যাবে।...দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে বই নিয়ে লাইব্রেরি যেতে হবে।" কথাটা বলেই রতন আচমকা হাঁটতে শুরু করল শিবিকে ফেলে রেখে।

নয়

বিকেলে হরনাথ লেনে চব্বিশ নম্বর বাড়ির সামনে রিকশা থেকে দুজনে যখন নামল তখনও পর্যন্ত রতনের শরীর উত্তেজনায় টানটান হয়েছিল। মাকে প্রণাম করতেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। তার চোখেও জল এসেছিল। মা ছুটে গিয়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ে। সে আর ফিরে তাকায়নি, কাপড়ের ঝোলাটা বগলে নিয়ে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শুধু বলেছিল, "আমি এসে তোমায় দেখে যাব মা।"

তখন থেকেই শরীরটা তার শক্ত লাগছিল। মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু করে অনিশ্চিত জীবনে ঢোকার উত্তেজনা, শিবি গলিটার দিকে তাকিয়ে প্রথম কথা বলল, "এত সরু !"

কথাটা শুনেই রতনের মনে হল, শিবি সুখী হবে না। তালা খুলে দরজার পাল্লা ঠেলে দিয়ে রতন প্রচুর আশা নিয়ে তাকাল। শিবির মুখে ভাবান্তর দেখতে পেল না। রিকশা থেকে দুজনে হাতে হাতে তোশক বালিস, উনুন, বালতি আর খুচরো জিনিসগুলো নিয়ে এসে ঘরে রাখল। পাশাপাশি আর সামনের বাড়ি থেকে কিছু কৌতূহলী চোখ তাদের লক্ষ করল।

সদ্য কলি হওয়া ঘর ভরে রয়েছে চুনের গন্ধে। রতন জানালা খুলে দিল।

"কী গরম ঘরটায় ! হাওয়াটাওয়া ঢোকার তো উপায় নেই, নাকের সামনেই দেয়াল।" শিবি আঁচল দিয়ে গলা মুছল।

"পাখা ভাড়া করতে হবে।" খাটে তোশক পাতায় ব্যস্ত রতন বলল।

"মেঝেটা জল দিয়ে ধুতে হবে। রান্নার জায়গাটা দেখি। কলতলাটা কোথায় ?"

ওরা ঘর ধোয়ামোছায় ব্যস্ত হয়ে রইল কিছুক্ষণ। খাটের নীচে ঝাঁটা দিয়ে জল টানতে গিয়ে বেরিয়ে এল ঢাকনা দেওয়া এক বিঘৎ লম্বা চৌকো পুরনো একটা কাঠের বাক্স। শিবি সেটা দেয়ালের তাকে তুলে রেখে মেঝেয় ঝাঁটা ঘষতে লাগল। বাক্সটা চোখে পড়তে রতন, "এটা কোথায় পেলে।" বলে তুলে নিল। ধুলোময়লায় কালো হয়ে আছে। খুঁটিয়ে দেখতেই চোখে পড়ল বাক্সের তিন দিকে লতাপাতা আর আঙুরের থোকা খোদাই করা। কব্জা লাগানো রয়েছে ঢাকনাটায়। সে ঢাকনা খুলল। ভিতরটায় ময়লা নেই। কাঠের রঙ ঈষৎ হলদেটে। কৌতূহলে সে বাক্সটা নাকের কাছে ধরে গন্ধ

শুঁকল। হালকা চন্দনের গন্ধ পেল। "দ্যাখো, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই লাভ হল। চন্দন কাঠের বাক্স, গয়নাটয়না রাখা হয়। মার একটা ছিল, দিদিকে দিয়ে দিয়েছে।"

"কার না কার জিনিস, ফেলে দাও।" নাক সিঁটকে উঠল শিবির।

"ফেলব কি! কত কারুকার্য করা, চন্দনকাঠের, এর দাম আছে। থাক এটা।" রতন হাত তুলে উপরের তাকটায় বাক্সটা রাখল।

"থলেটা নিয়ে একবার বেরোও। খুঁজে দেখো কয়লার দোকানটা কোথায়। সের দশেক কয়লা ভাঙিয়ে এনো, দশ বারোটা ঘুঁটে চাই। একটা বোতল কিনে কেরোসিন এনো। তারপর মুদির দোকান যেতে হবে। সকালে কেনার সময় হবে না। আজ রাতটা কোনওমতে কাটাই, কালই পাখা ভাড়ার দোকানের খোঁজে বেরোব।" শিবি উপরে চোখ তুলল। কড়িকাঠে লাগান লোহার হুকটা দেখে বলল, "আগের লোকেদের পাখা ছিল।" জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "ঘরটা যেন খাঁচা, বাইরে তাকালেই ইট বার করা দেয়াল দেখতে হবে। আর ঘর পেলে না?"

রতন মৃদু স্বরে বলল, "তুমি কিন্তু বলেছিলে, 'যেভাবে রাখবে সেভাবেই আমি থাকব', মনে আছে?"

"বলেছিলুম তো কী হয়েছে?" ঝাঁঝিয়ে উঠল শিবি। "অমন অনেক কথাই লোকে বলে, সব কি ধরে বসে থাকতে হয়।...আমাদের পাকা ছাত ছিল না। কিন্তু ঘরে আলোবাতাস ছিল। যাকগে এ সব বলে এখন আর কী হবে, কপালে যা আছে তাই হবে।"

এই হচ্ছে শিবি, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রতন। কখনওই সন্তুষ্ট থাকে না। ও সুখী হতে জানে না। ওর কথাবার্তা আচরণ অন্যের মনে কতটা আঘাত করে সেটা বোঝার ক্ষমতা নেই। রতন ভাবল, বোধহয় ভুল করেছি আগাগোড়া। "থলে দাও।" সে উঠে দাঁড়াল।

"একটা গায়ে মাখা সাবান এনো। চান না করলে ঘুমোতে পারব না।"

রাতে শোয়ার আগে ঘরের আলো নিবিয়ে শিবি শাড়ি ব্লাউজ, ব্রেশিয়ার খুলে বিছানায় শুয়ে জড়িয়ে ধরল রতনকে। "কি মানুষ গা, কাঠের মতো শুয়ে আছ?" আদুরে গলায় বলল, "আজ আমাদের প্রথম রাত না?"

রতন যে ভয়টা করছিল, চার দিন পর সেটা ঘটল। আস্তাকুঁড়ে জঞ্জাল ফেলতে গেছিল শিবি। তখন পাশের বাড়ির দরজায় দাঁড়ানো ধরগিন্নি তাকে দেখে বলে, "তোমরা বুঝি নতুন ভাড়া এয়েচ। আগে কোথায় থাকতে? কে সন্ধান দিল ঘরের?" এইভাবেই আলাপটা শুরু হয়েছিল। মিনিট দশেক তাদের মধ্যে কথা হয়।

বর্ধন প্রেস থেকে বেরিয়ে রতন লাইব্রেরি যায় বই পাল্টাতে। হেঁটে ফিরে এল সন্ধ্যার পর। পথে মুড়ি আর সদ্য ভাজা বেগুনি কিনেছিল। ঠোঙা হাতে ঘরে ঢোকামাত্র শিবি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

"আমাকে মেরে ফেলার ফন্দি এঁটেচ...তোমার পেটে পেটে অ্যাতো ! এই খাটে একটা লোক রোগে ভুগে ভুগে শেষে গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে আর সেই খাটে আমায় তুমি শুইয়েচ ?...ছি ছি ছি। এখন তো আমার রোগে ধরবে...তুমি মিটমিটে, সব চেপে গ্যাচো। লেখাপড়া করা ভদ্দরলোক না হাতি।"

রতন ঠোঙা ধরা হাতটা তুলে শান্ত করাবার ভঙ্গিতে বলল, "অত উতলা হচ্ছ কেন, ক্যান্সার তো ছোঁয়াচে রোগ নয় !"

"এই ঘরে অপদেবতা আছে জেনেও তুমি ভাড়া নিয়েচ ? কুড়িটা টাকা কম হবে বলে লোভ সামলাতে পারলে না ? সারা দুপুর বিকেল একা একা আমি এই ঘরে কাটাব ?...পারব না, এখানে থাকতে হলে আমি মরে যাব।" শিবি পাগলের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে দু হাত ছুঁড়ল। হাত লেগে ঠোঙা ছিটকে পড়ে মুড়ি ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। রতন খাটে বসে পড়ল মাথা নামিয়ে। শিবিকে এখন কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে শিবি মেঝেয় বসে দু হাতে মাথা চেপে ধরল। "মা ঠিকই বলেছিল, সব্বোনাশ হবে। তাই হল, একটা মরা লোকের খাটে কিনা আমায় শুতে হল ! কোনদিন ভূতে এসে গলা টিপে মেরে রাখবে।...এখানে আমি থাকব না, ঘর দ্যাকো।"

সেই রাত থেকে শিবি মেঝেয় শুতে শুরু করল। ওকে সঙ্গ দেবার জন্য সে বর্ধন প্রেস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে থাকল। একদিন বিকেলে ফিরে দেখল দরজায় তালা দেওয়া, সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। প্রায় আধঘণ্টা পর দেখল শিবি আসছে। রতনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বলল, "মায়ের কাছে গেছলুম। তুমি তো ঘর বদলাবে না ঠিক করেচই, দেখি আমি চেষ্টা করে পাই কিনা।"

ঘরে ঢুকে রতন বলল, "ঘরের চেষ্টা কি করিনি ভেবেছ ? একটু ভাল, ভদ্রভাবে থাকতে গেলে এখন তিন-চারশো টাকার কমে পাওয়া যাবে না, পাঁচ-ছ হাজার সেলামি চায়। কোথায় পাব অত টাকা ?"

"চেষ্টা করেচ ? তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করব ভেবেচ ?...মায়ের কাছে গিয়ে থাকব, কাজকম্মের চেষ্টা করব। রুমালের ব্যবসা ওরা তুলে না দিলে দুটো টাকা রোজগার করতে পারতুম, একটা ভাল শাড়ি কেনার পয়সা জমাতে পারতুম।"

রতন চুপ করে খাটে বসে শুনে গেল। আজকাল শিবি প্রায়ই আক্ষেপ করে। বলে বটে মার কাছে চলে যাব কিন্তু এখনও যায়নি। যেমন সে দিনের পর থেকে ও আর খাটে শোয়নি। রতন ভেবেছিল খাটটা বিক্রি করে দেবে কিন্তু কীসের একটা গোঁয়ার্তুমি তাকে পেয়ে বসল, সে বিক্রি করতে রাজি হয়নি। ক্যান্সার ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ নয় তা হলে কেন সে ভয় পাবে ?

শিবি রান্নায় ব্যস্ত হল। রতন আনমনে এধার ওধার তাকাল। উপরের তাকে কাঠের বাক্সটা তার চোখে পড়ল। বাক্সটা পেড়ে সে ফুঁ দিয়ে ধুলো

ঝাড়ল। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষল। অবশেষে সাবান জল দিয়ে ধুয়ে চন্দন কাঠের আসল রঙটা বার করল।

"বাহ্‌, বেশ সুন্দর তো বাক্সটা!" শিবি মুগ্ধ চোখে তাকাল। "ময়লা জমেছিল বলে বোঝা যাচ্ছিল না।...এতে গয়না রাখত নাকি?"

"কী করে বলব, কী রাখত! তবে দামি জিনিস, প্রেমের চিঠি এই রকম বাক্সে রাখে।"

"আমার আর দামি জিনিস কী আছে, একটা সোনার গয়নাও তো নেই আর কোনওদিন হবেও না।...পেমের চিঠিফিঠি লিখবে কে, লেখার লোক কোথা?"

বাক্সটা তাকে রেখে রতন বলল, "লিখতে পারি, পড়ে মানে বুঝতে পারবে তো?"

শিবির মুখ বেঁকে উঠল। "লিখতে পারি! মনের মধ্যে পেম থাকলে তো!"

এই রকমই উত্তর রতন আশা করেছিল। সে ধরেই নিয়েছে তাদের মধ্যে কটু সম্পর্কটা আর মধুর হবে না। প্রথম দেখার দিন থেকেই সে জেনেছে শিবির মধ্যে পাগলামি আছে। ও সুখী হবার জন্য ব্যস্ত নয়। এক একসময় তার মনে হয়, যতদিন তারা একসঙ্গে থাকবে ততদিন ঝগড়াঝাঁটি চলবে, স্বামী এবং স্ত্রী হিসেবে তাদের জন্য বরাদ্দ সময়সীমা এ বার বোধহয় তারা অতিক্রম করতে চলেছে।

দাম্পত্য জীবনের বিশ্রী ঝগড়াটা একদিন তাদের মধ্যে ঘটে যেতেই রতন বুঝেছিল ভাঙন আসবে। রাতের খাওয়া সেরে বিছানায় চিত হয়ে সে উপন্যাস পড়ছিল। চমৎকার জমাটি গল্প, বুঁদ হয়ে গেছিল বইয়ের মধ্যে। শিবি খাটের পাশে মেঝেয় পা ছড়িয়ে ছুঁচসুতো দিয়ে শাড়ির নীচে ফলস পাড় বসাচ্ছে। হঠাৎ সে বলল, "আজকাল তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ, সংসারের দিকে আর তাকাওই না। আমার সঙ্গে কথাও আর বলো না।"

রতনের কানে কথাটা ঢুকল না। উপন্যাসে ডুবে গেলে মৃদু স্বরে বলা কথা কানে যায় না। কিছুক্ষণ পর শিবি অধৈর্য স্বরে বলল, "কথা কানে গেল কি?"

হাসিমাখা মুখটা বই থেকে তুলে একবার শিবির দিকে তাকিয়েই রতন আবার পড়ায় ডুবে গেল।

"এত পড়লে চোখ খারাপ হয়ে যায়।"

"খারাপ হয় না।" বই থেকে চোখ না সরিয়ে রতন বলল।

"বাবা বলত শুধু গবেটরাই বই পড়ে, ওদের শিক্ষাদীক্ষার দরকার আছে তো।"

কথাটা রতনের কানে ঢুকতেই মাথাটা গরম হয়ে উঠল। গম্ভীর স্বরে সে বলল, "তোমার বাবা কথাটা বলেছেন যেহেতু লেখাপড়া তিনি কখনও করেননি। লেখাপড়া যারা করে, তাদের হিংসে করতেন।"

"তোমাদের মতো বিদ্যের গোবরপোরা মাথাগুলোদের হিংসে করার কোনও দরকার হয় না। আমার বাবা যা রোজগার করত তার আদ্দেকও তুমি করো না।"

শিবি চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দগুলোকে ছিবড়ের মতো করে মুখ থেকে বার করে ফেলল।

"বই তুমিও পড়তে পারো, অনেক কিছু শিখতে পারবে।"

"আমার তো ভীমরতি ধরেনি, অনেক কাজ করতে হয় আমাকে।"

শিবিকে খেপিয়ে তুলে বই পড়াটা সে মাটি করতে চায় না। শান্ত গলায় সে বলল, "এখন এসব কথা থাক, বলার একটা সময় আছে। বইটা আমায় পড়তে দাও, ক্লান্ত লাগছে।"

"কী লাগছে ? কেলান্ত ? ওটা কি শুধু তোমারই জন্য ! একটু চেষ্টাচরিত্তির করে দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার করো না যাতে বাসন মাজার একটা লোক রাখা যায়। রাস্তায় গিয়ে জঞ্জাল ফেলে যার বৌ তার আবার কোনও মানসম্মান আছে নাকি ?"

রতন কথা না বাড়াবার জন্য চুপ করে রইল। তাইতে শিবির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। হাত বাড়িয়ে রতনের বুকের কাছে ধরা বইটা ছোঁ মেরে তুলে সে বলল, "খালি বই আর বই... গাধারও অধম।" বইটা খোলা দরজা দিয়ে সে গলিতে ছুঁড়ে ফেলল।

অন্ধ রাগ রতনের চেতনাকে দাউদাউ করে জ্বালিয়ে তুলল। লাফিয়ে উঠে বসে সে শিবির গালে চড় কষাল। লাইব্রেরির বই, নষ্ট হলে ছিঁড়ে গেলে ফাইন দিতে হবে। তাই নয়, বইটা ভাল লাগছিল পড়তে, পড়ায় ব্যাঘাতটা তার অসহ্য লেগেছে।

শিবি গালে হাত দিয়ে জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে বলল, "গায়ে হাত তুললে !"

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর শিবির গর্ভপাত হয়। আড়াই মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। পাড়াতেই ডাক্তার থাকায় রতনকে বেশিক্ষণ দুর্ভাবনায় থাকতে হয়নি। শিবি খাটের বদলে মেঝেয় শুয়ে থাকার জেদ ধরায় ডাক্তার অবশ্য বিস্মিত এবং বিরক্ত হয়েছিলেন।

"অপদেবতা ঘরে থাকলে এই রকমই হয়... আরও হবে।" কাতর স্বরে শিবি বলেছিল দাঁত চেপে। রতনের ইচ্ছে করেছিল ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। দেয়নি। ভেবেছিল প্রেস থেকে কয়েক দিন ছুটি নিয়ে শিবিকে সঙ্গ দেবে। কিন্তু পরদিন থেকেই সাংসারিক কাজকর্মে ওকে ব্যস্ত হতে দেখে আর ছুটি নেয়নি। শিবি এরপর থেকে একটু বদলে যায়। কথা কম বলতে থাকে। কারণ থাকলেও ঝগড়া এড়িয়ে যায়। তাকে প্রায়ই অন্যমনস্ক লাগে। একদিন রতন দেখল কাঠের বাক্সটা নিয়ে শিবি নাড়াচাড়া করছে।

"এটা কি পেমপত্তর রাখার জন্য ? তুমি কি ঠিক জানো ?" শিবি জিজ্ঞাসা,

করে। চোখ কৌতূহলে ভরা। "এটা যার ছিল সে পেম করত!" নিঃশব্দ হাসিতে ওর মুখ ভরে গেল।

"প্রেমপত্তরই যে রাখতে হবে তার কী মানে আছে। গয়নাগাটি, টাকাপয়সাও তো রাখা যায়।"

এর মাস দেড়েক পর সন্ধ্যাবেলা প্রেস থেকে ফিরে রতন দেখল ঘরের দরজার একটা কড়ায় তালাটা ঝুলছে, দরজায় শিকল তোলা। এভাবে তালা না দিয়ে শিবির ঘর বন্ধ করে বাইরে যাওয়া আগে কখনও ঘটেনি। ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে সে চারধারে তাকাল। দামি জিনিস কিছু না থাকলেও, পুরনো গামছাও এইসব পাড়ায় চুরি হয়।

বিছানার উপর চন্দন কাঠের বাক্সটা পড়ে রয়েছে, তুলে নিয়ে রতন ঢাকনা খুলল, ভিতরে একটা কাগজ। হ্যান্ডবিলের পিছনের সাদা দিকটায় শিবি লিখেছে : "আমি চিরদিনের মতো তোমাকে ছেড়ে চলে যাইতেছি আর ফিরিব না।"

গোটা দশেক মাত্র শব্দ। হাতের লেখা পাঠশালার পড়ুয়াদের মতো। রতনের চোয়াল কয়েক সেকেন্ডের জন্য শক্ত হয়ে রইল। দীর্ঘশ্বাস পড়ার পর তার স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল। চিরকুটটা কাঠের বাক্সে ভরে রেখে সেটা সে উপরের তাকে তুলে রাখল। এই রকম কিছু একটা যে ঘটতে পারে ইদানীং সেটাই তার মনে হচ্ছিল। কোনওদিক থেকেই তাদের মধ্যে মনের মিল বা বনিবনা হয়নি। এইভাবে একসঙ্গে বসবাসের থেকে শিবি নিজেই সমস্যাটা মিটিয়ে দেওয়ায় মনের গভীরে রতন ক্ষীণ একটা স্বস্তি বোধ করল। চিৎকার ঝগড়া হল না, জিনিসপত্তর ভাঙা বা ছোঁড়াও হল না, কেমন দিব্যিই সে বিনা ঝঞ্ঝাটে একা হয়ে গেল।

শিবির চলে যাওয়ার দায় তার ঘাড়ে চাপাতে পারে একমাত্র শিবির মা। ওকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখা উচিত, তাই পরের দিন সন্ধ্যাতেই সে গোলাপ দত্ত লেনে হাজির হল। দরজা খুলে তাকে দেখেই শিবির মার মুখে অস্বস্তি ফুটল।

"ভেতরে এসো।" মৃদুস্বরে বলল শিবির মা।

"না, এইখানে দাঁড়িয়েই বলে যাই।... শিবি কাল আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। একটা চিঠি লিখে বলেছে আর ফিরবে না। কথাটা আপনাকে জানিয়ে গেলুম।"

"চলে গেছে?" না প্রশ্ন না বিস্ময় এমন একটা স্বরে কথাটা বলল শিবির মা। রতনের মনে হল কোথায় যেতে পারে হয়তো জানে।

"তা হলে বোধহয় সত্যচরণের কাছেই গেছে। যাত্রা করে, রোজগারও অনেক। শিবিকে বলেছিল তো যাত্রায় নামিয়ে দেবে। আজকাল মেয়েরাও তো যাত্রা করছে।"

"যার কাছেই যাক আমার তা জানার ইচ্ছে নেই। ...আচ্ছা চলি।"

রতনের জীবনের যে ছকটা গত দু বছরে গড়ে উঠেছিল সেটা নাড়া খেল শিবির চলে যাওয়ায়। একই ঘরে একটি মেয়ের সঙ্গে বসবাস করার পর তার অভাবটা বোধ হবেই। শিবির চলে যাওয়ার পর খাট সিলিং ফ্যান, কাপড় ঝোলানোর দড়ি থেকে শিলনোড়া, সব কিছুই তার চোখে কিছুদিন অন্যরকম ঠেকেছিল। সে একটা কেরোসিন স্টোভ কিনে নিজের হাতে রান্না শুরু করল। অধিকাংশ দিন সে বাইরে হোটেলেই খায়। অমিয়কে সে এই গৃহত্যাগ সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানায়নি। পাড়ার লোকেরাও টের পায়নি। প্রতিবেশীদের কারুর সঙ্গে পরিচয় নেই, কেউ তাকে জিজ্ঞাসাও করবে না। বাড়িওলার সঙ্গে মাসে একদিন দেখা হয় ভাড়া দিতে গিয়ে। কিন্তু কাশি ঘোষ কখনওই ভাড়াটের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কৌতূহল দেখায়নি। তা ছাড়া যদি কেউ ব্যাপারটা জানতে পারে তা হলে জানুক, জানাজানি হলে সে মোটেই লজ্জায় পড়বে না। আগে হলে পড়ত। তার নিজের ভিতরটা যে পালটে গেছে রতন সেটা বুঝতে পারে। অদ্ভুত একটা নিরাসক্তি তাকে ক্রমশ গ্রাস করে নিয়েছে। জীবন কখনও একরকম থাকে না, এটা সে ধরেই নিয়েছে। নিজে মা কাকাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় সে যা ভেবেছিল এখনও তা বিশ্বাস করে। জীবন অনেক ভাবেই তো বদলায়, শিবির সঙ্গে বাস করাও বদল আবার শিবিকে ছাড়া বাস করাও আর একটা বদল। বরাতে যা আছে তা হবেই। মেনে নিয়ে চলতে হবে নয়তো শান্তি পাওয়া যাবে না।

রতন প্রথম প্রথম ঘরে ফিরে সময় কাটাতে খুবই অসুবিধে বোধ করত। নিজেকে টানতে টানতে একাকী দিন আর রাত কাটানোটা তাকে শিখতে হয়েছে। সে একটা ট্রানজিস্টর রেডিও কিনল আর যতক্ষণ ঘরে থাকে সেটা চালিয়ে রাখে। গান, নাটক, খবর, কথিকা যা কানে আসে তাই শোনে। খবরের কাগজ রাখতে শুরু করল। এমনকী প্রতি রাতে শোবার আগে এখন সে একটা সিগারেটও খায়। মাসের পর মাস বছরের পর রতনের কাছে জীবন এল আর বয়স বাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে, তার ধারণা সে সুখেই আছে। শিবি তার স্মৃতিতে ধূসর হয়ে গেছে।

সময়ের ধুলো স্মৃতি থেকে টোকা মেরে উড়িয়ে দিয়ে এগারো বছর পর এক সন্ধ্যায় শিবি এসে হাজির হল। হঠাৎ ওকে দরজায় দেখে রতন চমকে উঠল। অস্ফুটে বলল, "তুমি!"

"ভূত দেখার মতো যে চমকে উঠলে, আসব?"

"এসো।"

"দূর থেকে দেখলুম তুমি সিগ্রেট কিনলে, এখন ওসব খাচ্ছ?" শিবি ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল।

"বোসো।"

খাটে না বসে শিবি কাঠের টুলটা টেনে নিয়ে বসল।

"তুমি দেখছি বদলাওনি, খাটে বসলে না।"

"বদলাইনি !" শিবি চোখ বড় করে তাকাল। রতনের প্রথমবার দেখা শিবিকে মনে পড়ল। শিবির শরীর বদলেছে, এখন সে মোটা হয়েছে। ফুল লতাপাতার ছাপ দেওয়া কমদামি একটা সুতির শাড়ি ওর পরনে। চুলে চিরুনি পড়েনি, ঘাড় পর্যন্ত চুল ছেঁটে ফেলা। হাতের তেলতেলা মসৃণ চামড়া খসখসে।

শিবিকে দেখে রতন খুশি বা অখুশি কিছুই হল না, তবে বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠেছিল। দিনগুলো যতই শিবির সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছে ততই তাদের বিবাহিত জীবন সঙ্কুচিত হয়ে একটা বছরে, একটা মাসে, একটা দিনে, একটা ফুলকিতে পরিণত হয়েছে।

"কেমন আছ ?" শিবি বলল। "অনেকদিন পর।"

"হ্যাঁ, অনেক দিন পর।" কথাটা শিবির মতো স্বাচ্ছন্দ্যে সে বলতে পারল না।

"মনে হচ্ছে ভালই আছ।" শিবির কথা বলার ধরন, উচ্চারণ যে বদলে গেছে এটা রতনের কানে ঠেকল। রাতের জন্য কেনা সিগারেটটা ঠোঁটে লাগিয়ে সে দেশলাই জ্বালাল।

"দিনে কটা খাও।"

"একটাই, রাতে খাওয়ার পর।"

"একা একা ভালই থাকতে পারো দেখছি।"

"না পেরে উপায় কী !" রতনের গলায় বিদ্রূপ নেই। শিবি ভ্রূ তুলল। রতনের নজরে পড়ল ওর ভ্রূ সরু আর ধনুকের মতো বাঁকানো। ঠোঁটে হালকা গোলাপি রঙ। শিবিকে বয়স্কা মনে হচ্ছে অন্যভাবে। দশ-এগারো বছর আগে ও যা ছিল সেটা আড়ালে রাখার জন্য যেন হালকা ছদ্মবেশ মুখে পরেছে।

শিবি তাকের দিকে চেয়ে রয়েছে। রতন মুখ ফিরিয়ে তাকাল। চন্দন কাঠের বাক্সটা শিবি দেখছে।

"করছ কী, চলছে কেমন ?" রতন বলল

"ভালই আছি।"

আগের মতো শিবি অনর্গল কথা বলছে না। রতন লক্ষ করল কথার মধ্যে চিমটি নেই, স্বরটা চাপা, সাদামাটা, হয়তো এত বছর পরও তাকে এই ঘরে একা দেখতে পাওয়ায়, ঘরের সবকিছু পুরনো দিনের যেমন ছিল ঠিক তেমনটিই রয়ে যাওয়ায় শিবি নিশ্চয় অবাক হয়ে গেছে। ট্রানজিস্টরটাই শুধু ওর কাছে নতুন।

"কাজকর্ম কিছু করছ ?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার জন্যই বোধহয় না শোনার ভান করে শিবি চন্দনকাঠের বাক্সটার দিকে চেয়ে রইল।

"এখন থাকো কোথায় ?"

"এন্টালিতে থাকি।"

ইতস্তত করে রতন বলল, "একা ?"

"হ্যাঁ।" কথাটা বলে শিবি মাথা নামিয়ে রাখল। রতনের মনে হল, ওর জীবনীশক্তির অনেকটাই খয়ে গেছে। চাহনিতে আগেকার ঝকঝকানিটা স্তিমিত। চোখের নীচে চামড়াটা ফোলা। বয়স হয়েছে শিবির।

মাথাটা হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে শিবি বলল, "তুমি সেই আগের মতো মিনমিনেই রয়ে গেছ।"

"তা রয়ে গেছি।"

"যদি না রইতে... তাহলে আমরা হয়তো—।" শিবির গলায় আবেগ নেই।

"বড্ড দেরি হয়ে গেছে। হইচই ঝগড়াঝাটি আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ।"

"অনেক বই দেখছি।"

"সময় কাটাতে হবে তো !"

কিছুক্ষণ কেউ আর কথা বলল না। রেডিওয় এই সময় খবর হয়, রতন নিয়মিত তা শোনে। আজ সে রেডিও খুলল না।

"বাক্সটা আমার খুব পছন্দ।"

"ওটা চাই তোমার ? নিতে পারো।"

"সত্যি সত্যি দেবে !"

"নিশ্চয়, আমার তো কোনও কাজে লাগে না।"

রতন বাক্সটা তুলে হাত দিয়ে মুছল। "এই নাও।"

শিবি বাক্স হাতে নিয়ে উঠল। "যাই, পরে আর এক দিন আসব।"

"অবশ্য আসবে, যখন ইচ্ছে হবে।"

ওকে এগিয়ে দেবার জন্য রতন ঘর থেকে বেরোল না। অনেকক্ষণ পর একটা কিউবা ভ্রমণের বই পড়তে পড়তে তার মনে হল শিবিকে তো জিজ্ঞাসা করা হল না, ছেলেপুলে হয়েছে কি না। তারপর মনে পড়ল, ও যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন সে হেসেছিল তখন শিবি আগের মতো ঠোঁট টেপা মুচকি হাসির বদলে যান্ত্রিকভাবে ঠোঁট দুটো টেনে ধরে।

দু দিন পর সকালে রতন লন্ড্রি থেকে কাচানো শার্ট আর ধুতি আনতে গেল। লন্ড্রির গায়েই ভাঙা, পুরনো নানান শৌখিন জিনিসের দোকান। ফেরার সময় সে দোকানটার দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা বেহালা আর বেতের টেবল ল্যাম্পের মাঝখানে চন্দন কাঠের বাক্সটাকে দেখতে পেল।

প্রায় এক মিনিট সে তাকিয়ে রইল। কী করে এটা এখানে এল। নিশ্চয়ই শিবিই সেদিন ফেরার সময় এখানে বিক্রি করে দিয়ে গেছে। অভাবের তাড়না ছাড়া এমন কাজ করবেই বা কেন, বেচারা! টাকার যদি দরকার তো চাইলেই পারত।

বাক্সটা হাতে নিয়ে রতন বলল, "কত ?"

দোকানদার তীক্ষ্ণ একটা চাউনিতে রতনের মুখটা দেখে নিয়ে বলল, "আসল চন্দন কাঠের, পনেরো টাকা।"

দরাদরি করলে কমানো যাবে কিন্তু ইচ্ছে করল না। দাম চুকিয়ে রতন বাক্সটা নিয়ে ফিরল। তার মনে হতে লাগল শিবি আবার আসবে। এবং কয়েকদিন পর সত্যিই এল, একই সময়ে একই শাড়ি পরে। ওর মুখ দেখেই তার মনে হল, শিবি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত।

"পাঁউরুটি আর ডিমসেদ্ধ আছে, চলবে ?"

শিবি মাথা নামিয়ে কী যেন ভাবল। "দাও, কিন্তু তোমার ?"

"এইমাত্র খেলুম। তবে আর এক কাপ চা খাব তোমার সঙ্গে।" রতন যে মিথ্যা বলল শিবি নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এই নিয়ে ন্যাকামি না করায় রতন স্বস্তি বোধ করল।

খাওয়ার সময় শিবির মুখের দিকে তাকাবে না ঠিক করেই সে পিছন ফিরে চা করতে বসল। তাকটা শিবির চোখের সামনে, নিশ্চয় এতক্ষণে বাক্সটা নজরে পড়েছে। কিছু একটা ও বলবে নিশ্চয়। রতন চায়ের গ্লাস শিবির হাতে তুলে দিয়ে খাটে বসে ওর মুখের দিকে তাকাল। পাঁউরুটি প্লেটে আর নেই কিন্তু শিবি চিবিয়েই চলেছে। একবার তাকের দিকে চোখ ফেলল কোনও বিস্ময় ফুটল না বাক্সটা দেখে। রতন তাতে একটু হতাশ হল।

"একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে কাজের ব্যাপারে।"

কাঠের বাক্সটা সম্পর্কে একটা কথাও নয়। "কাজ চলছে কেমন ?"

"কাজ নেই ছাড়িয়ে দিয়েছে। ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাপড়ের ছাঁট এইসব বাছাই করার কাজ, রোজ ছ'টাকা। শরীর খারাপ হয়ে চার দিন যেতে পারিনি তাই আর কাজে বসতে দেয়নি।"

মাসে শ দেড়েক টাকা। একটা লোক আধপেটা খেয়েও মাস চালাতে পারবে না। রতনের মনে হল শিবি বোধ হয় ফিরে আসতে চায়। যদি চায়, তাহলে সে থাকতে পারে। ও যা মেয়ে, তাতে সোজাসুজিই কথাটা বলে ফেলতে পারে। তবে রতন যেচে ওকে থাকতে বলবে না।

শিবি আবার বাক্সটার দিকে তাকাল। "আমাকে দশটা টাকা ধার দিতে পারো ?"

"পারি।" দড়িতে ঝোলান শার্টের পকেট থেকে রতন একটা দশ টাকার নোট বার করল। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শিবি কিছু বলল না।

"সামনের হপ্তায় শোধ করে দোব। ততদিনে কাজ একটা নিশ্চয় পেয়ে যাব।" শিবি উঠে দাঁড়াল। বাক্সটার দিকে আবার তাকাল। "বেশ দেখতে, তাই না ? আমার খুব পছন্দের।"

শিবি চলে গেল। পুরনো জিনিসের দোকানে বাক্সটা বেচে দেওয়া নিয়ে একটি কথাও সে বলল না। এরপর থেকে শিবি প্রায়ই আসতে শুরু করল।......তারা এটা-ওটা নিয়ে কথা বলত, গুরুতর বিষয়ে কখনও নয়।

কোনওদিন চুপ করে বসে তারা রেডিওয় গান বা নাটক শুনত। রতন কখনও চা তৈরি করত, কখনও করত না। তারা পরস্পরের কাছে খুব সহজ হয়ে গেছিল। একটা আলগা ধরনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তারা অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও সান্নিধ্যটা উপভোগ করত। রতনের ধারণা একসঙ্গে এত ভাল সময় তারা আর কখনও কাটায়নি।

ফিরে যাবার সময় কয়েকটা টাকা ধার না নিয়ে শিবি যেত না। রতন প্রতিবারই দিয়েছে কিন্তু ধার কখনওই শোধ হয়নি। তাই নিয়ে সে কিছু মনে করত না কেননা কিছুক্ষণের এই সময়টাকে সে মনে করত খুব শস্তায়ই পেয়ে যাচ্ছে। ধারের অঙ্কটা অবশ্য দশ থেকে পঁচিশ টাকায় উঠেছিল যখন শিবি মারা যায়।

জগৎসংসারে শিবির কেউ নেই, বাস্তব এই তথ্যটি সম্পর্কে রতন সজাগ ছিল। শিবিকে সে একবারের জন্য জিজ্ঞাসা করেনি তার মার কথা, কোথায় সে থাকে, কিভাবে থাকে, একা না কারুর সঙ্গে, কী কাজ করছে, কত রোজগার করছে। তবে শিবি নিজেই একবার বলেছিল এখন সে বেনেপুকুরে থাকে, পার্কসার্কাসে একটা চামড়ার কারখানায় কাজ করছে।

রতনের ঘরে শিবি যতবারই এসেছে মাঝে মাঝেই চন্দনকাঠের বাক্সটার দিকে সে তাকাত। তার মতে ওটা খুব সুন্দর, ওটাকে রতনের কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না। লতাপাতা আর আঙুরের থোকা যে কাঠের রঙের সঙ্গে কত মানিয়েছে সেটাও বলত। বাক্সটা তাকে দিয়ে দেবার ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলত। কিন্তু পুরনো জিনিসের দোকানে বাক্সটা আর দেখতে না চাওয়ার জন্য রতন ইঙ্গিতগুলো না বোঝার ভান করত।

একবার রতন শিবিকে কিছু বেশি টাকা দিতে চেয়েছিল, শিবি কথাটা কানে নেয়নি। তার মনে হয়েছিল বিক্রি করে টাকা পাবার জন্য শিবি বাক্সটা চায় না বা নিজের ঘরে রাখার জন্যও নয়। শিবি চায় পুরনো জিনিসের দোকানে বেচে দিলে তৃতীয় কেউ ওটা কিনবে তাহলে দুজনের কারুর কাছেই বাক্সটা আর থাকবে না।

অবশেষে শিবি একদিন সোজাসুজিই বাক্সটা চেয়ে বসল। রতন তাকে প্রত্যাখ্যান করল না। আগের মতো হাত দিয়ে মুছে সে যেভাবে দিয়েছিল সেই ভাবেই শিবির হাতে সেটা তুলে দেয়। শিবিকে তখন খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

তার পর আবার সেই পুরনো ব্যাপার। রতন পর দিন পুরনো জিনিসের দোকানে কৌতূহল নিয়ে গেল। দূর থেকেই দেখতে পেল একটা চামড়ার মেয়েদের ব্যাগ আর নিকেলের ফোটোফ্রেমের মাঝখানে বাক্সটা রয়েছে। রতন আর ওটাকে ফিরিয়ে আনল না। পুরনো জিনিসের মাঝেই ওটা থাক।

শিবি মারা যায় লরির ধাক্কায়। রাত একটা নাগাদ একটা ট্যাক্সি থেকে নেমে সি আই টি রোড পার হবার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল। ফুটপাথের এক বাসিন্দা

দেখেছিল ট্যাক্সি থেকে নেমে শিবি টলছিল এবং সেইভাবেই রাস্তা পার হচ্ছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই সে মারা যায়। নাক-মুখ থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছিল।

রতন এই সব কথা জেনেছে শিবির এক প্রতিবেশির কাছ থেকে। পর পর তিন সপ্তাহ শিবি না আসায় রতন উসখুস করতে শুরু করে। বাক্সটা তাকের উপর না দেখে তার মনে হতে থাকে ওটা ওকে দিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। বাক্সটা দেখার লোভেই ও আসত। একদিন সে পুরনো জিনিসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বাক্সটাকে খুঁজল, দেখতে পেল না। কেউ হয়তো কিনে নিয়েছে।

পরদিনই সে বর্ধন প্রেস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে শিবিকে খুঁজতে বেনেপুকুর রওনা হল। শিবি বলেছিল বাস থেকে নেমে পুব দিকের গলিতে ঢোকার আগে গলির মুখে পানের দোকান থেকে মিঠে পান কেনে। পানের দোকানের ভিতর চার রকম রঙের কাচের শেড দেওয়া আলো আছে। শেডটা ঘোরে আর চার রকম রঙ ঝলকায়। বলেছিল আলোর ঝিলিক দেখতে তার ভাল লাগে।

আধ ঘণ্টার চেষ্টায় রতন পানের দোকানটা খুঁজে বার করল। পানওয়ালা বিহারী। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বললে, "সেই মেয়েমানুষটা তো লরি চাপা পড়ে মরে গেছে ওইখানে।" আঙুল দিয়ে একটু দূরের রাস্তাটা সে দেখাল। "তা কুড়ি পঁচিশ দিন তো হয়ে গেল। আপনি ওর কে হন ?"

"আত্মীয় হই।" রতনের ভিতরটা মুহূর্তের জন্য পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হল। পানওয়ালার কাছ থেকে সে জেনে নিল, এই গলিটার মধ্যে বস্তির কোন ঘরে শিবি থাকত।

রতন খুঁজে পেল অল্পবয়সী রুগণ একটি বউ তাকে জানাল, "শিবানীদি তো এই পাশের ঘরেই থাকত।"

সেই ঘরে এখন নতুন ভাড়াটে এসে গেছে।

"আমরা তো খবর পেলুম পরের দিন সকালে। থানা থেকে লোক এসেছিল খোঁজ করতে। আমরা তো ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। কোনওদিন কাউকে ওর কাছে আসতেও দেখিনি। বলত, কোন আত্মীয়স্বজন নেই, একা।"

"ওর কোনও জিনিসপত্তর ছিল না ?"

"জিনিস ! ওই রান্নার একটা হাঁড়ি, একটা কড়া, থালা, গেলাস, দুটো শাড়ি। তেমন কিছু থাকার মতো অবস্থা তো ছিল না। রোজগারের সে যে লাইন ধরেছিল তাতে বয়স না থাকলে কি আর টাকা কামানো যায় !"

এই সময় বউটির পাশে দাঁড়ানো বছর আটেকের ছেলেটি বলে ফেলে, "মা শিবানীমাসির বাক্সটা ?"

কড়া চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বউটি বলল, "একটা নকশাকাটা ছোট

কাঠের বাক্সো ওর ঘরে ছিল সেটা আমি রেখে দিয়েছি, নিয়ে যাবেন তো নিয়ে যান।”

“কই দেখি।”

সেই চন্দনকাঠের বাক্সটাই। হাতে নিয়ে রতনের মনে পড়ল, পুরনো জিনিসের দোকানে এটা ঠিকই সে দেখেছিল। কিন্তু তার পর শিবিই এটাকে কিনে নিয়ে গেছে। নিশ্চয় বিক্রির দামের থেকে বেশিই ওকে দিতে হয়েছে।

“না থাক, এটা রেখে দিন।” তাদের দুজনের কেউ নয়, তৃতীয় কারুর কাছেই বাক্সটা থাকুক।

এখন রতন রোজ রাতে আলো নেবাবার আগে উপরের তাকের দিকে একবার তাকায়। বউটি বাক্সটা দিতে চেয়েছিল, ফিরিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল কি ছিল না, ঘুমিয়ে পড়ার আগে এই জিজ্ঞাসাটা নিয়ে সে রোজই একটু ভাবে। রতন নিশ্চিত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এর উত্তর সে বার করতে পারবে না।
